ভাগবতী তনু নিগমানন্দ

নারায়ণী দেবী

প্রথম প্রকাশঃ ঝুলন পূর্ণিমা ১৩ই ভাদ্র ১৩৭২

প্রাপ্তিস্থানঃ

১। আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও তদন্তর্গত শাখাশ্রম সমূহ

২। নিগমানন্দ আসন মন্দির, সাতরাপুর রোড, ভুবনেশ্বর ২, ওড়িষা

৩। মহেশ লাইব্রেরী ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৪। সর্ব্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন

৫। জয়গুরু পুস্তকালয়, ১২/১ বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

৬। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

মুদ্রণেঃ দেবী প্রেস, ৫৭।২ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণেঃ এস, জি, প্রসেস, ৩৪ জাষ্টিস্ মন্মথ মুখার্জী রো, কলিকাতা—৯

সত্ত্বাধিকারীঃ নীলাচল সারস্বত সংঘ (কুমারী বিভাগ)
নিগমানন্দ আসন মন্দির, সাতরাপুর রোড
ভুবনেশ্বর—২, ওড়িষা

সূচী

নিদান কথা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় দেবতাকে দুইভাবে দেখেছেন। এক দয়িত বল্লভরূপে। কবি নিজে তখন কান্তা। এর সুপরিচিত উদাহরণ তাঁর 'জীবন দেবতা' —

'কী দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ—
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে বিজন বিপিনে ফুটি'।

কিন্তু জীবন-দেবতাকে কবি আবার এক মহিমময়ী মহেশ্বরীরূপেও দেখেছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রণয়ী। এর উদাহরণও তাঁর বহুল প্রচারিত একটি কবিতা হতে দেওয়া যায়। কবিতাটি 'এবার ফিরাও মোরে।' রবীন্দ্রনাথ সেখানে এক 'নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা'র কথা বলছেন; যাঁর জন্য যুগ-যুগান্তর ধরে মহাপ্রাণে 'হোম-হুতাশন' জ্বলে চলেছে। 'তারি বিশ্ববিজয়িনী প্রেমমূর্ত্তিখানি' অন্তরে রেখে কবি চলেছেন 'জীবনকণ্টকপথে'—

'*   *   *   দীর্ঘপথশেষে
জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্ন বদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্ত-কণ্ঠে বরমাল্যখানি
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব দুঃখ গ্লানি।

পুরুষ তাঁর ইষ্টকে নারীরূপে বন্দনা। ... বাঙালী

এ-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সে-ইষ্ট সাধারণত মাতৃস্বরূপা, রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতির বেলায় যা দেখি। ইষ্টকে প্রেয়সীজ্ঞানে কবি যেমন বলে উঠলেন—

'হবে হবে হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রাণী
হে মহিমময়ী॥'

ঠিক এ ভাবের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট পরিচয় নাই। ভাবটি কিন্তু ভুঁইফোড় কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ একদা শ্রীঅরবিন্দকে বলেছিলেন 'স্বদেশ-আত্মার বাণী মূর্তি তুমি।' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। তিনিও ভারতবর্ষের সনাতন বাণীকেই রূপ দিয়েছেন সারাজীবন ধরে। আবার যেহেতু তিনি বাঙ্গালী, কাজেই বাংলার যুগসঞ্চিত মর্মকথা তাঁর মাধ্যমে মুখর হয়ে উঠেছে এতেও সন্দেহ নাই। পরমতত্ত্বকে প্রিয়ারূপে দেখার একটি ধারা বাঙ্গালী মরমীয়াদের (Mystics) মধ্যে চিরদিন ফল্গুস্রোতে প্রবহমান ছিল। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হতে পারে। কিন্তু এখানে তার স্থানাভাব। আমরা কেবল রবীন্দ্রনাথ হতে ধারাটি ধরে উজিয়ে গিয়ে তার উৎস সন্ধান করব।

১২৬১ সালে শ্রীহট্টে হাছন রাজা চৌধুরী নামে এক মুসলমান সাধকের জন্ম হয়। রামপাশায় তাঁর নাকি বিরাট জমিদারী ছিল। কিন্তু তিনি ফকিরী নিয়ে হিন্দু দেবদেবী সম্বন্ধে বহু পদ রচনা করেন। তাঁর 'হাছন উদাস' এমনি নানা পদের বিখ্যাত সংগ্রহ। তিনি বলছেন—

আমি তোমার কাঙালী গো সুন্দরী রাধা
আমি তোমার কাঙ্গালী।
তোমার লাইগা কাইন্দা ফিরে
হাছন রাজায় বাঙ্গালী গো॥

এই 'বাঙ্গালী' কথাটি লক্ষ্য করবার মত। কবিচিত্তের সহজ বোধে হাছন বুঝি ধরতে পেরেছিলেন রাধার জন্য কেঁদে ফেরাটা বিশেষ করে বাঙ্গালীরই 'মরমকথা।' আর, রাধার নাম করে তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিলেন বৈষ্ণব সহজিয়াদের কথা—বাংলায় যার শিরোমণি চণ্ডীদাস—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়ন তারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা॥

* * *

রাধে, ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গাচরণে
শরণ লইনু আমি॥

আরও পিছিয়ে যাই। যে-চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদিম নিদর্শন বলে মনে করেন পণ্ডিতরা, তার একটি পদ—

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভৈলি।
নিতন ঘরণী চণ্ডালী লেলী॥

চণ্ডালী একটি সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা। যিনি অস্পৃশ্যা অ-ধরা সেই মহাশক্তিই চণ্ডালিকা। ভুসুকু বলছেন চণ্ডালীকে ঘরণী করে তিনি এবার সত্যই বাঙ্গালী হলেন। রাধা-উপাসক হাছনও বাঙ্গালী, ভুসুকুও বাঙ্গালী। মহামহেশ্বরীকে কান্তাভাবে ভজনা করা বাঙ্গালী শাক্তদের একটা বিশেষ ধারা ছিল—এই-ই কি মনে হয় না এ থেকে?

আবার, এ যদি চণ্ডাল কন্যাকে সাধন-সঙ্গিনী-গ্রহণ করা হয় তাহলে বলব ভুসুকুর উত্তরসূরী বীরভূমের সহজিয়া চণ্ডীদাস—

শুন রজকিনী রামী
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি॥

ধোপানী রামী বড়ু চণ্ডীদাসের চোখে তত্ত্বত কে, চণ্ডীদাস নিজেই তা বলে গেছেন—

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী

অর্থাৎ রজকিনীতে সাধক মহাশক্তিকে আরোপ করছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য সেই পরমাপ্রকৃতি। চণ্ডীদাসের পূর্বসূরীদের চর্যাপদে এর অনুরূপ ভাবনা—

জোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পীবমি॥

এই যোগিনী যে সামান্যা নায়িকা নন সাধকের ইষ্টস্বরূপা, তার প্রমাণ নীচের পদটিতে—

তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেহেঁ।
বোহি কি লব্‌ভই এণ-বি দেহেঁ॥

ওগো তরুণি, তোমার নিরন্তর স্নেহ ছাড়া এ-দেহে বোধিলাভ কি সম্ভব?

সে-তরুণীর পরিচয় শঙ্করাচার্যের দেবীবন্দনায়—

গীর্দ্দেবতেতি গরুড়ধ্বজসুন্দরীতি
শাকম্ভরীতি শশিশেখরবল্লভেতি।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কেলিষু সংস্থিতায়ৈ
তস্যৈ নমস্ত্রিভুবনৈকগুরোস্তরুণ্যৈ॥

যিনি বাগ্‌দেবী, যিনি কমলা বা হরবল্লভা—তিনিই ত্রিভুবনগুরুর তরুণী। যোগসূত্রে পাই সবার গুরু বা জগদ্‌গুরু হলেন ঈশ্বর। তাঁর [illegible] পরমেশ্বরীই চর্যাপদের 'তরুণী'।*

* তুলনীয়: 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।' কিংবা
'ওগো তরুণি বেয়ে চল তরণী নাহি বেলা।'

একই ভাবধারা কেমন যুগ যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে বয়ে চলেছে ভারতের অধ্যাত্মলোকে, তার ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক বৈকি ! শঙ্করের সৌন্দর্যলহরীতে একটি শ্লোক পাচ্ছি—

মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো।

হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ হরমহিষি তে মন্মথকলাম্॥

চর্যাপদের উপরিধৃত একটি পদে এরই প্রতিফলন কিনা মরমীয়া তা বলতে পারবেন।*

মোট কথা, পরমদেবতাকে কান্তা কল্পনা করে পুরুষের কিশোরী ভজনের ধারা বাংলার বহু প্রাচীন ধারা। এবং তার সূত্র রয়েছে আরও অনেক পিছনে। আচার্য শঙ্কর মুখ্যত বৈদান্তিক বলে প্রসিদ্ধ। তাঁর ত্রিভুবনগুরু-তরুণী কি বেদান্তে আছেন? উত্তর খুঁজতে গিয়ে বৃহদারণ্যকে চোখে পড়বে—

আরাম্ অর্ধর্গলারির স্বঃ, তেনায়ম্ আকাশ স্ত্রিয়া পূর্য়ত এব।

ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, 'আমরা দুটিতে যেন ছোলার একটি খোসার মধ্যে দুটি দলের মত। তাইতে আমার এই আকাশ স্ত্রীতে পূর্ণ হয়েই আছে।' মধুরারতির ইষচ্চকিত আভাসে উক্তিটি রহস্যময়। অন্যত্র কিন্তু এই 'স্ত্রী'র সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ যাজ্ঞবল্ক্য তা সহজ করেই বলেছেন। তাঁর হৃদয়াকাশ যে-'স্ত্রীতে পূর্ণ হয়ে আছে' তিনি তাঁর 'প্রিয়া,' তিনি 'প্রাজ্ঞ আত্মা'। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রিয়া, যাঁর দ্বারা 'সম্পরিষ্বক্ত' হয়ে তিনি 'ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্', সেই 'স্ত্রী'কে আবার পেলাম কেনোপনিষদে—

তস্মিন্ এব আকাশে স্ত্রিয়ম্ আজগাম।

আচার্য শঙ্কর বললেন এই 'স্ত্রী' ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপা। অমনি আমাদের মনে পড়ে যাবে চণ্ডীদাসের পদ

'তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী'

* আরও তুলনীয় 'সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি'—সৌন্দর্যলহরী। অচ্যুতানন্দ টীকা করছেন—'আনন্দামৃতম্ উৎপাদয়সি।'

কেনোপনিষদের এই 'স্ত্রী' এই উমা হৈমবতীই শিবস্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রিয়া। তাঁরা দুটিতে যেন ডালের আধখানার মত। গিরিশ ঘোষ গান বাঁধলেন—

জয় জয় জয় হরপার্বতী
দ্বিদল-চণক পুরুষ-প্রকৃতি ॥

' তিনি বেদান্ত পড়েছিলেন হয়তো। না পড়লেও ক্ষতি ছিল না। এদেশের জল মাটিতে এদেশের হাওয়ায় এসব ভাবনা ছড়িয়ে গেছে। চণ্ডীদাস সম্ভবত বেদ-বেদান্ত আলোচনা না করেও লিখেছিলেন—

তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।'

কেনোপনিষদের মহাশক্তি বেদমাতা গায়ত্রী অবশ্যই। বাক্‌সূক্তে অম্ভৃণকন্যা তাঁর মহিমময়ী বাণীরূপ উপস্থাপিত করেছেন। 'স্ত্রী' শব্দটি বেদে খুব বেশী নাই। কিন্তু একটি সূক্তে উষাকে উদ্দেশ করে ঋষি বলছেন তিনি দিবোদুহিতা 'মহীয়মানা' এবং 'স্ত্রী' (৪।৩০।৮)। বেদে উষা প্রাতিভ সংবিতের প্রতীক, প্রবুদ্ধ চিত্তে 'তিমির বিদারি উদার অভ্যুদয়ে'র সূচনা। তিনি আলোর মেয়ে বা কন্যাকুমারী। গায়ত্রীকে ব্রাহ্মণে দ্যুলোক হতে সোম আহরণ করেন এমন একটি সুপর্ণী বলা হয়েছে। (ঐ. ব্রা. ৩।২৫, শ. ব্রা. ৪।২৬, ২৭)। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে বাক্-ই সোম আহরণ করেছিলেন, তিনি তখন একটি একবছরের মেয়ে। গায়ত্রী ও বাক্ যে একই, ছান্দোগ্যোপনিষদে তা স্পষ্টই বলা হয়েছে—

' বাগ্ বৈ গায়ত্রী।

এই গায়ত্রী বা বাক্ ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা (ঋ ১০।১১৪।৮)। সুতরাং কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী স্ত্রী এবং বাক্ বা গায়ত্রী একই তত্ত্ব। আবার উষাও যখন 'স্ত্রী' তখন উমা উষা স্ত্রী বাক্ ও গায়ত্রী এক পরমাপ্রকৃতিরই নামান্তর মাত্র।

আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধিতে এরপর একটা সংশয় দেখা দেয়। উষা

কন্যাকুমারী বাক্ একটি একবছরের মেয়ে। আবার তাঁরাই স্ত্রী—ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা অর্থাৎ সমর্থা তরুণী? এ কেমন হল?

রহস্য আরও ঘনিয়ে ওঠে যখন ঋগ্‌বেদে দেখি উষা একাধারে 'দুহিতা সূর্যস্য' (৪।৪৩।২) আবার 'সূর্যস্য যোষা' (৪।৭৫।৫)। উষা যেমন 'স্ত্রী' তেমনি অদিতিকে সংহিতায় বলা হয়েছে 'নারী' (৭।২০।৫) বিশেষণ বর্জিত এই সংজ্ঞায় বোঝা যায় তত্ত্বত তাঁরা এক এবং মহাপ্রকৃতি বা আদি রমণী। অদিতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি একাধারে মাতা পিতা ও পুত্র। ১।৮৯।১০) এবং দেবতারা অদিতির পুত্র বলেই আদিত্য (১০।৭২।১, ৫, ৮, ৯)। কিন্তু এ-ও বলা হয়েছে যে দক্ষ যেমন অদিতি হতে জন্মেছেন তেমনি আবার দক্ষ হতেই অদিতির জন্ম। (১০।৭২।৪,৫)। অর্থাৎ উষা যেমন একাধারে দুহিতা ও জায়া, অদিতি তেমনি একাধারে মাতা ও দুহিতা। এই সম্বন্ধ-বিপর্যয় চরমে উঠেছে সেইখানে, যেখানে বলা হয়েছে বাক্ বা গায়ত্রী

উত ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ (১০।৭১।৪)।

এতক্ষণের আলোচনায় জেনেছি উষা উমা হৈমবতী অদিতি ও গায়ত্রী একই তত্ত্বের বিভিন্ন নাম। তাঁরা মূলে মহাপ্রকৃতি পরমেশ্বরী, বিশ্বের আদি জননী। সেই জননী আবার দুহিতা হন শুধু নয়, হন 'উতলা জায়া'। কোন কোন ভাগ্যবান সাধকের কাছে তিনি 'তাঁর তনুখানি মেলে ধরেছেন, সুবসনা জায়া যেমন ধরে পতির কাছে উতলা হয়ে।'

জননীর জায়া হওয়া আর দুহিতার জায়া হওয়ার এই সংকেতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কোন্ সত্য ঋষি প্রকট করতে চাইছেন তা ধরতে হলে আমাদের আবার যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারস্থ হতে হয়। তিনি বলছেন অনুভবের চরমে পুরুষ-প্রকৃতি দুয়ে মিলে একটি ডালের মত। অর্ধ-নারীশ্বর তত্ত্বই তাহলে পূর্ণাদ্বৈত ভাবনার সারকথা। পরমহংস নিগমানন্দ ব্রহ্মরূপ বোঝাতে গিয়ে বললেন—

রতন আসনে বসে গৌরীশঙ্কর।

* * * *

দীন নলিনী কয় পদশোভা ভিন্ন নয়
যে-পদ ভাব না কেন ছোঁবে না যমকিঙ্কর ॥

কল্পপ্রভাতে পুরুষ-প্রকৃতি দুয়ে এক হয়ে আছেন। তারপর মহাশক্তির সৃজনসামর্থে পুরুষ বিগ্রহবান হলেন—শক্তি তাঁর জননী তখন। সংহিতার ভাষায় অদিতি হতে জন্মালেন প্রজাপতি দক্ষ। পুরাণে দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র। কিন্তু সংহিতায় তিনি সপ্তাদিত্যের অন্যতম, পরমব্যোমে তাঁর স্থান। এই পুরুষ মাতা অদিতির সিসৃক্ষা হৃদয়ে নিয়ে ভুবন গড়ে চলেন। তখন তিনি প্রাজাপত্য সূর্য' (ঈশ)। তিনি বাচস্পতি ও বিশ্বকর্মা (১০।৮১।৭)। দক্ষ শব্দের মৌলিক অর্থ সঙ্কল্পশক্তি। যে দিব্য সঙ্কল্পে বিশ্ব বিসৃষ্ট হয়, পুরুষই তার ধারক—এ-আত্ম পরিচয় পাওয়ার পর আদি জননীকে তিনি চিনে নেন তাঁরই আত্মশক্তি বলে। এই হল সমর্থ পুরুষের কাছে জননী গায়ত্রীর জায়া-রূপে আত্মদান। তারপর আবার নতুন সৃষ্টির প্রবর্তনা জাগে—প্রবর্তয়িতা এবার পুরুষ স্বয়ং। তিনি আত্মারাম হয়েও 'একাকী নৈব রেমে।' তাই তাঁর হৃদ্‌বিলাসিনী শক্তিকে তিনি প্রসর্পিতা করেন বর্হির্জগতে। সুতরাং দয়িতা তখন তাঁর দুহিতা। এই দুহিতা কলায় কলায় বেড়ে কবে আবার তাঁর জায়া-স্বরূপে উন্নীতা হবেন, সৃষ্টির মূলে জ্বলতে থাকে পুরুষের সেই আদি কামনার বহ্নি।

পুরুষ স্বরূপে নির্গুণ নির্বিকার চৈতন্যস্বরূপ—নির্বিশেষ অদ্বৈত-বাদীর এ দৃষ্টি মেনে নিলে বলতেই হয় সমগ্র সৃষ্টির বিধাত্রী মহা-প্রকৃতি। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি কি অন্যোন্য বিরোধী দুটি তত্ত্ব? কোন দর্শনেই তা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত নয়—যে-দৃষ্টিতে তা স্বীকৃত তা মতুয়ারের দৃষ্টি, 'দর্শন' তাকে বলা যায় না। এজন্য সমন্বয়ী দৃষ্টিতে পূর্ণাদ্বৈতবাদী দেখেন মহাপ্রকৃতি এবং আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষ মূলে অর্ধ-নারীশ্বর। এই যুগনদ্ধ সত্তা হতে প্রথমে পরমা প্রকৃতিই পুরুষের

সিসৃক্ষার সংবেগ নিয়ে সক্রিয়া হন। এ-পর্বে তাঁরই প্রাধান্য। তিনি শিশু অগ্নির মাতা, কুমারজননী। তাঁর সযত্নলালনে ওই কুমার যখন ষোড়শকল পূর্ণ পুরুষ হন, মা তখন জননী ভাব পরিহার করে জায়াস্বরূপে প্রকটিতা হন। আবার সেই অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বে সমাহিত হয় যোগীর চেতনা। কিন্তু তাঁর দায় এতেই ফুরায় না। এরপর থাকে সিদ্ধের সাধনা- সিসৃক্ষার উত্তরপর্ব।

এ-পর্বে পুরুষ জনক, পিতা। পরমা-প্রকৃতি তাঁকে অবতারিত করতে গিয়ে আধার সৃষ্টি করেছেন যখন তখন এ-বিশ্বে আপনাকে হাজারো টুকরায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা তাঁর অংশ কলা—পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতি। কিন্তু আত্মসচেতনা নয় বলে তারা 'অলখের খেলা ঘরে কন্যা কুমারিকা।' অসীম বাৎসল্যে ওই কন্যাকে লালন করার দায় এবার পুরুষের। সে যেদিন সমর্থা প্রকৃতি হয়ে অতি বড় বৃদ্ধ পরমপিতার কণ্ঠে মাল্যদান করবে সেদিন পুরুষের আত্মলাভ সুসম্পূর্ণ হবে—তার আগে নয়।

তাহলে পুরুষ একবার তপস্যা করেন স্ব-স্বরূপ লাভের জন্য, আরেকবার তপস্যা করেন স্বীয়া প্রকৃতিকে প্রবোধিতা করার জন্য। দুই পর্বেই কিন্তু লীলানাটকের সূত্রধারিনী মহেশ্বরী। তিনি নিজে লীলাজগৎ সৃষ্টি করে পুরুষকে সে লীলায় যোগ দেওয়ান—তখন তিনি "মাতৃরূপেন সংস্থিতা।' আবার তাঁর তত্ত্ব সম্যকরূপে জানার পর স্বরূপাবস্থিত পুরুষ তাঁরই প্রচোদনায় বিশ্বপ্রকৃতির ভাব সংশুদ্ধির দায় স্বীকার করেন। দেবী তখন গুরুশক্তিস্বরূপে পুরুষের 'বামাঙ্গ-পীঠে স্থিতা।'

তত্ত্বত মহাপ্রকৃতির জায়াভাবই আদিম। শিবকল্প যেসব মহা-পুরুষ 'সোঽহম্' জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের কাছে তিনি তাই 'প্রিয়া স্ত্রী'। অথচ গুণলীলার ক্ষেত্রে তিনি 'আধারভূতা' তাই আদিজননীও বটে। লোকবিচারে যিনি জননী লোকোত্তরে তিনিই পুরুষের 'রমণী'। চণ্ডীদাস এ-তত্ত্ব জানতেন। তাই বলেছিলেন—

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ ॥

তন্ত্রে আছে বশিষ্ঠ 'ত্রীং' মন্ত্রে দেবীর আরাধনা করে কৃতকাম হননি বলে দেবীকে অভিসম্পাত করেছিলেন। তারপর বধূবীজ বা 'স্ত্রীং' মন্ত্রে আরাধনা করেই দেবীর মহিমা তিনি জগতে প্রচার করেছেন। এই জন্য তিনি বশিষ্ঠারাধিতা তারা বলে প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য 'ত্রীং' মন্ত্রে দেবী তারিণী বা মাতৃরূপিণী। তাঁকে পেলেও সব পাওয়া হয় না। বশিষ্ঠের ওই অভিশাপ যেন পরশুরামের মাতৃহত্যা—মাকে অস্বীকার করা, অবিদ্যাগ্রস্ত বোধে পরিহার করা। শিববীর্যসম্পন্ন সাধকেরই এ-স্পর্দ্ধা সম্ভব। আদিজননীকে জায়ারূপে লাভ করেই বশিষ্ঠ হলেন গুরু--হলেন 'বসিষ্ঠ' কিনা উজ্জ্বলতম (< √বস্ আলো দেওয়া)। তখন তিনি সাক্ষাৎ বাচস্পতি (বাগ্ বৈ বসিষ্ঠ—ছা. উপ ৫।১।২)।

বাক্ যে ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা তা তো আমরা আগেই দেখেছি। গুরু তাঁর পতি আর 'সচ্চিদানন্দই গুরু। গুরু এক বৈ দুই নাই।'

বৈদিক যুগ হতে শক্তি-সাধনার যে বিশেষ ধারাটি বাংলায় সমাদর লাভ করেছিল রামপ্রসাদ যেন 'শ্লোকার্ধেন' তা জানিয়ে দিলেন -

'জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে ?'

কিন্তু সবাই এভাবে তাঁকে জানতে পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'শক্তি বিশেষ।' বলতেন কারও 'ছোট আধার', কারও 'খুব বড় আধার।' উপমা দিতেন যেমন 'ঘটি-বাটি' আবার 'জালা'। এর মধ্যে ভাল মন্দর কথা উঠছে না। মায়ের সংসারে ছোট্ট নিমকদানীটি হতে সরা গামলা পর্যন্ত সবই তো কাজে লাগে ! তফাৎ কেবল শক্তি-প্রকাশের তর-তম নিয়ে। বৈষ্ণব বলেন শ্রীভগবানেরও পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম প্রকাশভেদ রয়েছে।

পৌরুষের চেতনার পূর্ণতম প্রকাশে মহাশক্তির পূর্ণতম পরিচয় লাভ সম্ভব হতে পারে।

মর্ত্য আধারে এই 'দিবি সূর্যসহস্রস্য ভাঃ সদৃশী' চিৎ প্রভাসের প্রধান লক্ষণ বিনা আয়াসে বা সামান্য আয়াসেই জীবসত্ত্বের বিদ্যুদ্‌-বেগে চিন্ময়-পরিণাম—

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।'

তর্ক তো অনেক দূরের কথা। স্বাধ্যায়, মনন ও মনীষা সহায়ে তত্ত্বাধিগম, এমন কি 'বহু-শ্রুত' অর্থাৎ সাধনায় পরা-বাকের রহস্য বৈচিত্র্য জ্ঞানগোচর হলেও পরমকে পুরোপুরি হয়তো পাওয়া যায় না। তিনি আপনি এসে যখন ধরা দেন কেবল তখনই তাঁকে ষোল আনা পাওয়া হয়।

শ্রীনিগমানন্দ এই তত্ত্বের মূর্তবিগ্রহ।

সাত বছর বয়সে তিনি প্রথম দেবীর দর্শন পান। বালকের কাছে মাহেশ্বরী বালিকা মূর্তিতে এসেছিলেন। নলিনীকান্ত ঘুণাক্ষরেও জানতেন না দেবী সেদিনই স্বয়ংবরা হয়ে মনে-মনে পতিত্বে বরণ করেছেন তাঁকে। তাঁর জগৎ তখন মা-ময়। কিন্তু মায়ের আড়ালে থেকে পরমা-প্রকৃতি তাঁর হাত ধরেছেন। বালকের অস্ফুট চিত্তকোরক না-বলা এক দিব্য অনুরাগের আলোয় মহাদেবী সবার অলক্ষ্যে তখন হতেই ফোটাতে শুরু করেছিলেন।

তারপর ভূমিকম্পে মাটি ফেটে যাওয়ার মত মৃত্যুর অতর্কিত বিস্ফোরণে নলিনীকান্তের সুখের সংসার একদিন চুরমার হয়ে গেল। 'বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ' সেই শ্মশান আলো করে ফুটে উঠলেন ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপা উমা।

'প্রিয়া স্ত্রী' রূপে ত্রিপুরসুন্দরী সামনে এসে দাঁড়াতেই সচকিত পুরুষ যেন ঘুম ভেঙ্গে পূর্ণদৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকালেন। তন্ত্রের ভাষায় এ-ই শক্তিপাত, ভাগবতী কৃপার নিরন্ত নির্ঝর। কারণ 'নাত্মলাভাৎ পরো লাভঃ'।

নলিনীকান্ত ভাবতে বসলেন চরাচর যাঁকে 'অম্বা' বলে সম্বোধন করে সে আমার 'স্বীয়া'? আমি তার 'ভর্তা' ও 'ভোক্তা'?

যার-তার পক্ষে একথা ভাবা যে কি অসম্ভাব্য মরমীয়াই কেবল বুঝবেন। ভৈরবাবতার গিরিশ ঘোষ তাঁর হর-গৌরী নাটকে এর খানিকটা আঁচ দিয়েছেন। সেখানে দেখি শাঁখারীবেশী শিবকে চিনতে না পেরে তাঁর প্রগল্‌ভ ধৃষ্টতায় রুষ্টা হয়ে গিরিজা বলছেন—

'আমি জগন্মাতা, আমায় বলে নানান কথা!
মহেশ্বর বিনা কার মাথার উপর মাথা'?

সপ্তশতীতে এর শুদ্ধরূপ

'যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।'

অষ্ট নায়িকার অন্যতমা জয়া তাই মাকে বলেন—

'হয়ে ভয়ঙ্করী দেখা দাও শঙ্করি
শিব যদি না হয় শিবে,
তোমার করাল মূর্তি দেখে তখনি পরমাণু হবে॥'

এইবার আমরা 'মায়ের কৃপা' খুলে দেখতে পারি। তার প্রথমে রয়েছে—

'মরি মরি। দেবী রমণী-মূর্তিতে কী মনোরমাঙ্গী। নবযৌবনা কুমারী····।' এ-মুর্তি ভাবময়ী। উপাসকের প্রীত্যর্থে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোমত রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু পৌরুষের সত্তাই যে নলিনীকান্তের স্বতঃসিদ্ধ তা বোঝা যায় তখন, যখন এই 'সর্বশৃঙ্গার বেশধারিণী' 'জগজন-মোহিনী' বিগ্রহ দর্শনেও তাঁর সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা নিরাকৃত হল না। এ ক্ষেত্রে কোনও জয়াকে মধ্যস্থ হতে হল না। তিনি নিজেই দেবীর তত্ত্বময়ী মুর্তি দর্শন করতে চাইলেন। মহাবিদ্যার সে-রূপ 'অতীব ভয়ঙ্কর'। কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী পর্যন্ত ব্রহ্ম-শক্তির উচ্চণ্ড বিস্ফোরণ দেখে 'সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য' বলেছিলেন।

'দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম' (১১।২৫)।

যে সেই 'ভীষণাদতিভীষণা' চণ্ডিকাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেনি তার পক্ষে মাহেশ্বরী আমার প্রেয়সী এই কল্পনায় মগ্ন থাকা সম্ভব বটে।

কিন্তু তাঁকে অতি রৌদ্রা-মহাঘোরারূপে দর্শন করেও তাঁর সম্বন্ধে 'আমার স্ত্রী' এ-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখা যে কি কঠিন দ্বিতীয় কোন শিবকল্প পুরুষ ছাড়া অন্যে তার কি বুঝবে?

করালবদনা প্রচণ্ডচণ্ডিকাকে দেখেও শ্রীনিগমানন্দ 'পরমাণু' হয়ে গেলেন না। দাস্যভক্তি এল না তাঁর, বরং 'পরমাত্মা মহেশ্বরঃ'-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণাই এল।

'বশিষ্ঠারাধিতা তারা' দয়িতামূর্তিতে তাঁকে দর্শন দিচ্ছেন জেনে নলিনীকান্তের চেতনার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল। 'অণোরণীয়ান' জীবসত্তা হতে ওই 'মহতোমহীয়ানে'র আবির্ভাব ঘটছে, তারাপীঠে এইটি দেখেই যেন চোখ খুলে গেল তাঁর। এই জীব-অণুই কি তবে 'মহৎ' ও 'বৃহৎ' নয়?

তেইশ বছরের একটি ছেলের বুকে এমনি করে মহাভৈরব জেগে উঠলেন সেদিন।

একটা কথা আমরা ভেবে দেখিনা।

শ্রীনিগমানন্দ নিজের মুখে তাঁর জীবনকথা বলতে গিয়ে অনেক বার বলেছেন 'আমি জ্ঞান ভক্তি ভগবান এসব কিছু চেয়েই ঘর ছাড়িনি। ঘর ছেড়েছিলাম স্ত্রীকে ফিরে পাব এই দুরাশা নিয়ে।' অথচ সেই তিনিই আবার 'মায়ের কৃপা'য় লিখেছেন, 'তুমি কি চাও আমায় বোঝাতে পারনি' বামাখেপার এই সন্ধানী প্রশ্নে তাঁকে বলতে হল 'জ্ঞান চাই'। আচ্ছা, এতে তাঁর দুটি উক্তির মধ্যে গরমিল হল না?

আসলে দুটিই ঠিক। নলিনীকান্ত যে তারাপীঠে মৃতাকে ফিরে পাওয়ার আশা নিয়েই ছুটে গিয়েছিলেন তাতে কোন ভুল নাই। কাঁচ খুঁজতে কাঞ্চন মিলে গেল। তারপরও তাঁর যে-অতৃপ্তি উপনিষদ্ তারই প্রতিধ্বনি করে বলছেন 'নাল্পে সুখম্ অস্তি। ভূমা এব সুখম্।' এবং এই অল্পে সুখ না পাওয়াটাই তাঁর 'পরে 'মায়ের কৃপা'।

সুপ্ত পৌরুষ 'উমা হৈমবতী'র প্রেমেই প্রবোধিত হল। মায়ের কৃপার প্রথম কথা. তাই জ্ঞান-পিপাসা। আর পরিসমাপ্তি দেবীগীতার জ্ঞানোপদেশে।

হাজার বছরের অন্ধকার একটি দেশলাই-এর কাঠিতে নিমিষে দূর হয়ে যাওয়াকেই বলে ভগবৎকৃপা। নলিনীকান্ত সে-কৃপার ষোল আনার উপর আঠার আনা অধিকারী। বিশ্বেশ্বরীকে প্রত্যক্ষ করা মাত্র তাঁর পৌরুষের সংবিৎ ফিরে এল। 'মায়ের কৃপা' যিনি লিখেছিলেন তিনি স্পষ্ট দেখেছেন নলিনীকান্তের প্রাকৃত চেতনায় মৃতার প্রতি অনুরাগই প্রথম ও প্রধান কথা হলেও অপ্রাকৃত চেতনার মূল সুর 'আত্মাববোধ'। তাই লিখছেন, 'যুবক উত্তর করিলেন "জ্ঞান চাই"। স্ত্রীকে চাই 'এহো বাহ্য।'

শ্রীনিগমানন্দের জীবন আদ্যন্ত এই প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের টানা-পোড়েনে বোনা 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান।'

এরপর জ্ঞানের সাধনায় যোগপথে নির্বীজ সমাধিতে 'নির্বিকল্পাবস্থা' লাভ হল তাঁর। তোতাপুরী চল্লিশ বছরের সাধনায় নির্বিকল্পে আরূঢ় হয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশী সময় লাগলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। কারণ—

'দুর্গং পথস্তদ্ কবয়ো বদন্তি।'

তাহলে শ্রীনিগমানন্দ মাত্র তিনবছরে দুরাপনীয়-কে পেলেন কি করে? গোড়াতেই সেকথা হয়ে গেছে তো! তিনি 'বৃত পুরুষ', খৃষ্টান মরমীয়ার ভাষায় 'Chosen'। নেপথ্য হতে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যে শক্তির 'রাশ ঠেলে' দিয়েছে তাঁর ভিতরে। তিনি জন্ম হতে পুরুষ, প্রকৃতি তাঁর দাসী। পথের বাধা সে-ই ঠেলে দূর করেছে।

'আমার যখন যা দরকার কে যেন পিছন থেকে তা যুগিয়ে দিয়েছে।'

মায়ের এ-আনুকূল্য সাধকমাত্রেই পায়। কিন্তু বীরভাবের সাধক পান না। প্রমাণ, ব্রহ্মানন্দ গিরি। অথচ নিগমানন্দ

পেয়েছিলেন। তার অর্থ গিরি মহারাজ শিবত্বের সাধক, নিগমানন্দ শিবত্বে সিদ্ধ। তাঁর সাধনকাণ্ড অবশ্যই জন্মজন্মান্তরে নিষ্পন্ন হয়েছে। এবার শুধু 'সিদ্ধিযোগ'।

'আমি গুরু' এই বিরাট অভিমান নিয়ে শ্রীনিগমানন্দ ব্যথিত হলেন। প্রাকৃত অহন্তাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'কাঁচা আমি।' 'পাকা আমি' তা নয়। সে আমি নিত্যজীবের স্বরূপ 'ভক্ত আমি দাস আমি।' শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেই শুনি 'লোকশিক্ষার জন্য' শুকদেব শঙ্করাচার্য এঁরা 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন। এ হল ঈশ্বর কোটির 'আমি'। উপনিষদে আরেক অহন্তা আছে—সে হল ব্রহ্মের অহংবোধ 'অহং ব্রহ্মাস্মি।' অহং-এর এই বিপুল বিস্ফারণই শৈবদর্শনে পরাহন্তা—পরমশিবের অহংবোধ।

শ্রীনিগমানন্দের 'পাকা আমি' যদি 'আমি গুরু,' 'আমি সেই পুরুষ' বোধে বিধৃত থাকে তাহলে কি আমরা তাঁকে, শৈবদর্শনের ভাষায় 'মহামাহেশ্বর বিজ্ঞান ভৈরব' বলতে পারি?

না, তা বলা যায় না। সূক্ষ্ম একটা আপত্তি ওঠে। সোঽহং জ্ঞান বৈদিক সাধনার পরম ফল। একা শ্রীনিগমানন্দ সে জ্ঞান আয়ত্ব করেন নি। অসম্প্রজ্ঞাত যোগে সিদ্ধিলাভ করাও এই একজনের কৃতিত্ব নয়। দেবভূমি ভারতবর্ষে অগণিত ব্রহ্মবিৎ পুরুষের জন্ম হয়নি কি? তবে শ্রীনিগমানন্দের বিশেষত্ব কোথায়?

তাহলে আবার বলতে হয় 'শক্তিবিশেষ'। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের মধ্যেও তর-তম আছে। উপনিষদে 'ব্রহ্মিষ্ঠঃ' 'ব্রহ্ম বিদাং বরিষ্ঠঃ' এসব সংজ্ঞা আছে। কথা হল, ব্রহ্মের ইতি করা যায় না। যাঁর যেমন শক্তি, তিনি সেই মত তাঁকে জানেন। ব্রহ্মজ্ঞ হন সকলেই—কিন্তু শক্তি অনুযায়ী। সে-জানার তারতম্য ঘটে।

ব্রহ্মতত্ত্ব পুরুষ-প্রকৃতি বা ঈশ্বর-শক্তিতে দ্বিদলচণকবৎ। 'স

আত্মানম্ দ্বেধা অপাতয়ৎ' (বৃ. আ. উপ ১।৪।৩)* । আবার উপনিষদেই আছে 'ব্রহ্মবিদ ব্রহ্ম এব ভবতি ।' প্রশ্ন ওঠে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ঈশ্বর-স্বরূপ নিশ্চয়ই । কিন্তু শক্তিতেও তিনি কি 'ব্রহ্ম এব' হন ? বৈদান্তিক বলবেন না, ব্রহ্মের সঙ্গে সিদ্ধপুরুষের ভোগসাম্য ঘটে শক্তিসাম্য ঘটে না ।

কথাটা একহিসাবে সত্য । কিন্তু দু'একজন এর ব্যতিক্রম থাকতেও পারেন । যদি শিব-স্বরূপ লাভ করে এই দেহে কেউ 'শক্ত্যালিঙ্গিত' হন ? আদ্যাশক্তি স্বেচ্ছায় যদি জায়াভাবে আত্মদান করেন তাঁর কাছে ? তাঁকেই শৈবদর্শন 'মহামাহেশ্বর' আখ্যা দিয়েছেন ।

সন্দেহ কি 'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।' এখন দেখা যাক শ্রীনিগমানন্দকে এমনি কোন দুর্লভদর্শন পুরুষ বলা যায় কি-না ।

নির্বিকল্পের জ্ঞান নিয়ে ব্যুত্থিত হয়েও শ্রীনিগমানন্দের অপূর্ণতার ক্ষোভ গেল না । অমৃতস্বরূপ ত্রিপাদে ব্রহ্মবিদ্ একরাট্ । কিন্তু এই জাগ্রতের জগতে ? 'সর্বম্ ইদং ব্রহ্ম' জাগ্রৎ চেতনায় এ অনুভব তখনও নেমে আসছে না । নেতি নেতি বলে সুষুপ্তির বিজ্ঞানকে শুধু স্বীকার করছে । এ কেমন পূর্ণ জ্ঞান ? এক মহাবুভুক্ষা নিয়ে শ্রীনিগমানন্দ আবার পথে নামলেন ।

পুরাণের দিব্য কল্পনা তখন তাঁকে ঘিরে দানা বাঁধছে । অদ্বৈত অনুভবে তিনি 'শিব এব কেবলঃ' । কিন্তু ভিখারী শঙ্করের কোনও ঐশ্বর্য নাই, আকাশবৎ রিক্ত নিঃস্ব একেবারে । তবে কার শক্তিতে বিরাট জগৎচক্র পরিভ্রামিত হচ্ছে ? সে কি শিবের সতী নয় ? একদা ভারতের আরেক শিবাবতার 'ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী' বলে যাঁর

---

*এখানে একটু তর্কের অবকাশ রয়ে গেল । বেদান্ত বলতে আজকাল আমরা নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বুঝি । কিন্তু বেদান্তে নির্বিশেষ ও সবিশেষ দ্বৈত-বাদ উভয়ই স্বীকৃত । এই আদি বেদান্তই শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব বেদান্তের ভিত্তি । তন্ত্রে আমরা তার মূল পাব । সেখানে ব্রহ্ম বলতে শিব-শক্তির যুগনদ্ধতা ।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন দৈবচালিত হয়ে শ্রীনিগমানন্দও সেই অন্ন-পূর্ণার দুয়ারে এসে উপস্থিত হলেন।

মা তাঁকে ফেরালেন না। ফেরাবেন কেন? তিনি যে তাঁর কাশীপুরী (< √ কাশ্-'দীপ্তৌ'। এ-বিশ্ব 'দেবীধাম' জ্যোতিষ্মতী, তাই সোনার কাশী। মৃন্ময়ে চিন্ময়ের প্রকাশ হলেই কাশিকা) সাজিয়েছেন মহাভিক্ষুকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করবেন এই সংকল্প নিয়ে।

অন্ন কি? বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য তার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।—'সশক্তি বা পরমপুরুষ এসে মিলেছেন এই হৃদয়ে। এখানে লোহিতপিণ্ড দুটি তাঁদের অন্ন।'

অধিদৈবত দৃষ্টিতে লোহিতপিণ্ডটি বালসূর্য ভগ। ইনি হৃদয়াকাশে প্রেমের দেবতা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি 'ভূত ভব্যের ঈশান' অধূমক জ্যোতিস্বরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ। আবার অধিভূতদৃষ্টিতে লোহিত পিণ্ডটি আমাদের হৃৎপিণ্ড। যাজ্ঞবল্ক্য বুঝি বলতে চাইছেন, তোমার হৃৎপিণ্ডে বৃহদ্ ধমনীর তালে তালে যে প্রাণরস স্পন্দিত হচ্ছে তা পুরুষ-প্রকৃতিরই সম্ভুক্ত রস। অন্নদা বলতে তাঁরাই। সুতরাং, অন্নের স্বরূপ হল শিবশক্তি-সামরস্যজনিত আনন্দ।

জড় যে প্রতিমুহূর্তে চিদাবেশে চিন্ময় হচ্ছে এই জানাই অন্নব্রহ্মকে জানা। এ-বোধ হৃদয়ে পাওয়ার পথ লীলানাটকের 'সূত্র-ধারণকরী' স্বয়ং অন্নপূর্ণা ছাড়া আর কে দেখাবেন।

শ্রীনিগমানন্দ মনন ও মনীষা সহায়ে 'আকাশ শরীর' ব্রহ্মকে পেয়েছিলেন। কিন্তু 'হৃদয়-ব্রহ্ম'কে পাননি। অন্য কথায় 'সচ্চিৎ স্বরূপ'কে জেনেছেন, ব্রহ্মের আনন্দ-ভৈরবী রূপটি তো দেখেন নি।

তাঁর ভাষায় বলতে গেলে 'জ্ঞানের সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞান যখন ঘন-বিগ্রহরূপে দেখা দেবে তখনই ঠিক জ্ঞানলাভ হয়েছে বুঝতে হবে। এরই নাম ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মকে 'দর্শন' না করা পর্যন্ত প্রাণের হাহাকার মেটে না'।—(জী. বা. পৃ ২১১)।

কাশীতে সেইটি হল। সাতবছরের নলিনীকান্তকে যিনি গৌরী-রূপে দেখা দিয়েছিলেন তিনি তারাপীঠে এসেছিলেন ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা উমা হয়ে—বিদ্যুৎচকিত দর্শনে জানিয়ে দিয়েছিলেন 'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য'। তিনি এবার দেখা দিলেন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহে। বৈষ্ণব তাঁকেই বলছেন 'ভগবান আধা, সুন্দরী রাধা'।

'ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান তিনটিকে এক চোঙ্গায় এক কালে দর্শন করা যায়। এ না করতে পারলে পূর্ণজ্ঞান হয় না' (জী. বা. পৃ ২১১)।

জীব গোস্বামীর প্রসিদ্ধ উপমাটি শ্রীনিগমানন্দের হৃদ্য ছিল—সূর্য-কিরণ, সূর্যমণ্ডল আর সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তীপুরুষ। প্রথমটি ব্রহ্মেব উপমা, দ্বিতীয়টি পরমাত্মার আর তৃতীয়টি ভগবানের। শ্রীভগবানকে পুরুষ বলায় আমাদের প্রাকৃতবুদ্ধি ধাঁধায় পড়ে। তত্ত্বত ষড়ৈশ্বর্যশালী পরমপুরুষ বা ষড়ৈশ্বর্যশালিনী পরমাপ্রকৃতি দুয়ে এক—একে দুই।

কাশীতে 'এই প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী'কে তিনি দেখলেন। মাহেশ্বরী নির্বিশেষ তত্ত্ব। কিন্তু 'প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী' বলতেই তাঁর ভাগবতী তনু, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ।

ব্রহ্মময়ীকে প্রত্যক্ষ করে শ্রীনিগমানন্দকে বলতেই হল 'অদ্য প্রভৃত্যনবদ্যাঙ্গী তবাস্মি দাসঃ'।

আমি তোমার প্রেমের ভিখারী।

প্রজ্ঞা বিগলিত হল প্রেমে। মহাজ্ঞানেব সঙ্গে মিশল মহাভাব।

দেবকাব্যের এখানেই শেষ নয় কিন্তু।

বৈদিক সন্ন্যাসের পথে শাঙ্কর দর্শন শ্রীনিগমানন্দের দিশারী। 'অহং ব্রহ্ম অস্মি' এ-উপলব্ধি সে-পথে জানার চরম।

তাহলেই কথা ওঠে ব্রহ্ম বলতে কি বোঝা যায়, অস্তি ভাতি আর প্রীতি? শঙ্কর সদ্‌ব্রহ্ম এবং চিদ্‌ব্রহ্মের কথা বলেছেন। কিন্তু আনন্দ-ব্রহ্ম সম্পর্কে তাঁর আপত্তি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে সোচ্চার। তার অর্থ তিনি প্রথম হতেই নির্বিশেষবাদী। আনন্দ মানলেই শক্তি মানতে

হয়, প্রপঞ্চোল্লাস ব্রহ্মের আনন্দরূপ যে! দার্শনিক শঙ্কর নেতি নেতি বলে উজিয়ে চলেছেন, জগৎ তাঁর কাছে মিথ্যা। এমন-কি অনুভবের উত্তর কোটিতে সচ্চিৎ স্বরূপ বলেও যেন ব্রহ্মের ইতি করা যায় না। স্বরূপলক্ষণে ব্রহ্ম নিরূপাধিক। সেই আকাশবৎ মহাশূন্যতায় বৈদান্তিকের নির্বাণ।

কিন্তু ভারতবর্ষ যে আচার্যকে জ্ঞানমূর্তি ও শিবাবতার বলে পূজা দিয়েছে তিনি কি বৌদ্ধ শূন্যবাদীর মত একদেশদর্শী? দার্শনিক শঙ্কর পর-পক্ষ নিরস্ত করতে যা-ই বলে থাকুন, ভারতবর্ষ তাঁকে বিচার করেছে বেদান্ত ভাষ্যের সঙ্গে আনন্দ-লহরী মিলিয়ে।

'শিব যদি শক্তি যুক্ত হন তবেই তিনি মহা-মহেশ্বর। অন্যথায় তিনি অনড় অচল—শব মাত্র।' ই-কার শক্তিবীজ। শব শব্দটিতে শক্তি বীজ যোগ হলেই শিব—'ঈশানো ভূতভব্যস্য'। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বলতে শিব+শক্তি। আবার নির্বাণষট্কে শঙ্কর বলছেন 'চিদানন্দ-রূপো শিবোহহম্।' শিব তো শক্তি ছাড়া নন কখনও, তাই 'শিবোহহম্' বলতে গিয়ে চিৎ ও আনন্দ তাঁর স্বরূপ লক্ষণ না বলে পথ নাই। বস্তুত নেতিবাদ বিশ্লেষণ পন্থার (analitical view) পরম সত্য নিশ্চয়ই। কিন্তু ইতিবাদও বেদান্তে স্বীকৃত। শারীরক ভাষ্যে আচার্যও ব্রহ্মশক্তিকে না মেনে পারেন নি। কেনোপনিষৎ ভাষ্যেও ব্রহ্ম-বিদ্যাস্বরূপাকে আচার্য মেনেছেন। না মানার হেতু কিছু নাই। শাঙ্কর বেদান্তেই শক্তির কথা প্রকারান্তরে কেমন করে এসেছে দেখা যাক।

শিবই জীব হয়েছেন, যত্র জীব তত্র শিব। অথবা 'জীবঃ ব্রহ্ম এব' এ আমরা শুনেছি। কিন্তু এই জীব সর্বাংশে ব্রহ্ম হয়ে যায় বা শিব হয় কি? জীবত্বের সংস্কার অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান যে-সব মতবাদে পাকাপোক্ত সেখানে আপত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বেদান্ত কি বলেন?

প্রশ্নটি সহজ নয়। বোধ হয় দর্শনের সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন। উত্তরও

এক কথায় দেওয়া চলে না। প্রথম কথা হল, এ-প্রশ্নের মূলেই রয়েছে আমাদের বুদ্ধির দোষ। জীব যখন ব্রহ্ম হলেন তখন তো তিনি আর জীব নন্। তাহলে ব্রহ্মের সঙ্গে সর্বাংশে সাম্য হল কিনা এ কথা ওঠে কি করে? সাম্য বললেই বৈষম্যের সংস্কার পিছনে আছে বুঝতে হবে। গোলমাল সেইখানে।

ব্রহ্মকে জেনে জীব যখন 'ব্রহ্ম এব' তখন তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? নুনের পুতুল সাগরে মিশে সাগর হয়ে গেল। অসাম্যের কোন কথাই নাই। ব্রহ্মের জ্ঞান শক্তি ভোগ কোনটা তিনি পেলেন আর কোনটা পেলেন না, কে হিসাব করবে?

তাহলে সাম্যের কথা উঠছে এখানে, এই দ্বৈতের ভূমিতে। মুক্ত পুরুষ আর যদি জগতে না ফেরেন, বিদেহ মুক্তিতে তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে পরম সাম্য লাভ করে 'ব্রহ্ম এব' এ তো অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু ব্যুত্থানে যদি আবার জগতে ফিরতে হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে ব্রাহ্মীস্থিতি কতখানি তাঁর আয়ত্ত হয়েছে সে-হিসাব কষা চলে।

বেদান্ত এক কথায় বললেন মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য কখনও নিরঙ্কুশ হতে পারে না। 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' (তৈ, উপ ১।৬।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে যাই-ই থাকুক না কেন মনে রাখতে হবে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করলেও বিদ্বানের ঐশ্বর্য 'জগদ্‌ব্যাপারবর্জম্' (ব্র. সূ. ৪।৪।১৭)। 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধা' থাকলেও যে সূক্ষ্ম ভেদ যায় না দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস এই কিছুদিন আগেও তার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তিনি উপমা দিতেন যেন জলের উপর একটা 'রেখা' কি 'ছাইয়ের দড়ি'। মুক্ত পুরুষ যেমনি দেহে ফিরে এলেন অমনি ব্রহ্ম ও জীবে অতি সূক্ষ্ম একটা ভেদ দেখা দেবেই। প্রাকৃত জীবের ভেদবুদ্ধির মত তা অনতিক্রমণীয় নয় নিশ্চয়ই। ব্রহ্মবিৎ প্রতি মুহূর্তে অপার 'সম্বিৎ সুখ সাগরে' অবগাহন করে মুহুর্মুহু সে-ভেদ বিস্মৃত হন। তাঁর ব্রহ্ম সম্ভোগ নির্বাধ, তাই ভোগসাম্য আছে বলতে আপত্তি উঠছে না। কিন্তু ভেদ একটু আছে-ই এবং তা ভেদ-ই। সাস্ত চৌদ্দ পোয়ার মধ্যে

অনন্তের প্রতিফলন কেমন? যেন শিশিরে সূর্যবিম্ব ঝলসে উঠল। তবু শিশির কি সূর্য হয়? তেমনি 'বোধে বোধ' হলেও জ্ঞান ও শক্তিতে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম হতে ন্যূন। এদেহে থাকতে সে-ন্যূনতা যাবার নয়।

কেন ন্যূন, অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মুখেই তার উত্তর শোনা ভাল— 'জগদ্‌ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্য এব ঈশ্বরস্য' (শা. ভা. ৪/৪/১৭)।

আচার্য এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ অবস্থার কথা বলেছেন। পরমেশ্বর যখন সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্তা তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা মহাশক্তিস্বরূপ। আর নির্বিকার নিত্যমুক্তরূপে তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। তবে শঙ্কর ব্রহ্মশক্তি মানেন না কি রকম? অক্ষর ব্রহ্মের প্রতি তাঁর পক্ষপাত রয়েছে সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম সগুণ ও সবিকার হয়ে জগৎ বা এই ব্যক্ত একপাদে প্রকাশিত এ-ও তিনি বলছেন (ভাষ্য ৪।৪।১৯)। আর সেইজন্য মুক্তের ঐশ্বর্য কখনই পরমেশ্বরের তুল্য হতে পারে না বলতে গিয়ে আচার্য্য বলছেন—'তদায়ত্তৈবেয়ং স্বারাজ্য-প্রাপ্তিরুচ্যতে। যৎকারণমনন্তরং আপ্নোতি মনসস্পতিম্, (তৈ. উপ. ১।৬।২) ইত্যাহ। যো হি সর্ব মনসাম্পতিঃ পূর্বসিদ্ধ ঈশ্বরস্তং প্রাপ্নোতি। এতদুক্তং ভবতি। তদনুসারেণ চানন্তরং বাকপতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ শ্রোত্রপতি বিজ্ঞানপতিশ্চ ভবতীত্যাহ। এবমন্যত্রাপি যথাসম্ভবং নিত্যসিদ্ধে-শ্বরায়ত্তমেবেতরেষামৈশ্বর্যং যোজয়িতব্যম্॥ ৪।৪।১৮।

স্বারাজ্যপ্রাপ্তি হয় বলার পরই শ্রুতিতে আছে যিনি মনের পতি উপাসক তাঁকে পায়। শঙ্কর বলেছেন তার অর্থ তাঁকে পায় বলেই স্বরাট হয়। স্বারাজ্যপ্রাপ্তি পরমেশ্বরের প্রসাদলব্ধ এবং সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মুক্তপুরুষের যত ঋদ্ধি-সিদ্ধি সবই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের কৃপায় পাওয়া।

এইখানে অদ্বৈত জ্ঞান অব্যভিচারিণী ভক্তিতে বিগলিত হয়েছে এ না বলে উপায় নাই। যতক্ষণ দেহে আছেন ব্রহ্মবিৎ নিজেকে ঈশ্বরাধীন বলে জানবেন, গূঢ় কথা এ-ই। কাজেই পরম-সাম্য সে-অবস্থায় আসে কি করে?

তর্কের খাতিরে শঙ্কর অবশ্য ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ঈশ্বরসাযুজ্যে একটা ভেদ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য পায় না, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক পায়। বলাবাহুল্য নির্গুণ ব্রহ্ম নিঃশক্তিক। সুতরাং শক্তিসাম্যের কথাটা বাদ রয়েই গেল। আচার্য স্বয়ং নির্বিশেষ অদ্বৈতকেই শীর্ষস্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর মতে ব্রহ্মের নির্গুণ নির্বিকার অক্ষরাবস্থা লাভেই নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য। 'তাহার উপরে নাই'।

আচার্য ভুল বলেন নি। আরোহ ধারা বা উত্তার পন্থার পরম সত্য অক্ষর ব্রহ্মবাদ। জ্ঞানের শেষ সীমা বা মহাশূন্যের অনির্বাধ বৈপুল্যে ব্যষ্টি চেতনার নির্বাণ। ব্রহ্মের এই ঐশ্বর্য অমেয় অনুত্তর। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী সে-ঐশ্বর্যের অধিকার পান।

কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য বা মহাশক্তির বেলায়? যুক্তিবিচারে যে এক্ষেত্রে মুক্তাত্মার শক্তিসাম্য ঘটতে পারে না তা দেখা গেল। কিন্তু যুক্তি ছাড়াও অন্য একটা দিক আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথা বলতেন।

তিনি বলতেন 'কখনও মনিব চাকরকে আদর করে তাঁর পাশে ডেকে এনে বসান'। এ কিন্তু ভাবের বিচারে শক্তিসাম্য, এ হয়। এক জায়গায় বলছেন, 'ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সব ঐশ্বর্য তোমায় দেখাতে পারেন'। অর্থাৎ ভালবাসায় ভগবান ভক্তের কাছে বাঁধা পড়েন। দাস্যেই বাঁধা পড়েন, বাৎসল্যের কথা কি? জজের ছেলে বাপকে জজ বলে মানে না, ঘোড়া করে পিঠে উঠতে পারে। এ-ও তো এক ধরণের শক্তি-সাম্য? যদি মধুরারতিতে এই নিবিড় তাদাত্ম্য জন্মায় তখন কে ঈশ্বর কে জীব? 'ন সো রমণ ন হাম রমণী' এই পরম একাত্মতা যাঁর জন্মেছে তাঁর কি পরমসাম্যলাভের কিছু বাকী রইল?

আসলে শক্তিসাম্যের বিচার করতে গিয়ে বাইরের ঐশ্বর্যের বিচারটাই আমরা আগে করি। বিরাট বিশ্বে তাঁর অকল্পনীয় বিভূতি-

বিস্তর প্রতিনিয়ত আমাদের প্রলুব্ধ করে। এই দেবীমায়ার খুঁটি-নাটি জানব, একে আয়ত্ত করব মানুষের এ-দুরাগ্রহ বদ্ধমূল। তাই শক্তি-লাভের মত্ততায় সাধনা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে অসুর হয়ে ওঠে। মহাশক্তি তার অনায়ত্তই থেকে যায় তাতে। কিন্তু দেবীর মায়া থাক পড়ে, আমি দেবীকেই পেতে চাই এ যদি কারও সাধনা হয়? এটি দেবতা হওয়ার তপস্যা। যিনি এ-তপস্যায় সিদ্ধ হন তিনি দেবাদি দেব, তিনি শিব। মহাশক্তিকে তিনি নিশ্চয়ই পান।

শৈব বেদান্ত অদ্বৈতসিদ্ধির এই দিকটা তুলে ধরলেন। ব্রহ্ম আর মায়ার সম্বন্ধ কেমন? না, স্ত্রী-পুরুষের মত অন্যোন্যসঙ্গত। শিব ও শক্তিরূপে তাঁরা নিত্য যুগনদ্ধ। সুতরাং উত্তার পন্থার পরম সত্য নির্গুণ ব্রহ্মকে জেনে বা ব্রহ্মসাযুজ্যলাভান্তে কোনও ব্রহ্মবিৎ যদি ব্যুত্থান দশায় তাঁকে নিজ দয়িতা বলে গ্রহণ করে ভাবমুখে জাগ্রত সমাধিতে সমাহিত থাকেন তাঁর ঐশ্বর্য নিশ্চয় মাহেশ্বর্য।

নির্গুণ ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি। সগুণ ব্রহ্ম তাঁর মায়াশক্তি। আদি বেদান্তে মায়া পরব্রহ্মের নির্মাণী প্রজ্ঞা। দুই মিলে অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব। সেই তিনি আমার প্রিয়া স্ত্রী যদি হন, আমি কি অনীশ্বর অজ্ঞান? অনন্ত জ্ঞান আর শক্তি আমার হাতের মুঠায় তা জানি। কিন্তু আমি তা চাই না, চাই কেবল তাঁকে।

ব্রহ্মজ্ঞানের এই কেবলা ভক্তিতে নিঃশেষে গলে যাওয়াই সাধ্যাবধি। জ্ঞান আর প্রেম পৃথক নয়—যাঁর জ্ঞান তাঁরই প্রেম। ভাগবতী শক্তির সারাৎসার ওই প্রেম। পরমেশ্বর জ্ঞান প্রেমের মিলিত বিগ্রহ, অতএব অর্ধনারীশ্বর। এ-তত্ত্ব যাঁর হৃদয়ঙ্গত শৈব-বেদান্তে তিনিই বিজ্ঞানভৈরব মহামহেশ্বর। এই দেহে থেকেও তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং প্রেমে প্রতিষ্ঠিত।

তা-ই যদি হয় তাহলে বলতে পারি শ্রীনিগমানন্দের জীবনে এই মাহেশ্বর্য সম্পূর্ণ প্রকট। উত্তার পন্থার পরমাসিদ্ধি অসম্প্রজ্ঞাত যোগে নির্বিশেষ ব্রহ্মচেতনায় নির্বাণলাভ। সে-অবস্থায় তিনি 'ব্রহ্ম এব'।

কিন্তু সেই তিনিই ব্যুত্থানদশায় জগতে অবতরণকালে নির্বিশেষ চৈতন্যকে 'সগুণে সাকারে ফুঠে উঠতে' দেখলেন। তখনও তিনি নিজে নিরুপাধিক সাক্ষীসত্তায় আরূঢ়, নির্বিকল্প ভূমি তাঁর সহজসিদ্ধ। তাই তিনি পুরুষ আর ওই সগুণ ব্রহ্ম আচার্য শঙ্করের 'জগদীশ্বর', তাঁর কাছে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি। স্ত্রী-পুরুষের সামরস্যজনিত মহাভাবে 'প্রেমবিলাস বিবর্ত' শ্রীনিগমানন্দের জীবনবেদ। তাই ভাবের বিচারে তিনি শক্তিমান, তিনি শিবস্বরূপ—মহাশক্তি তাঁর প্রিয়া তাঁর মানসী। ভর্তা মহেশ্বর আমি—এই বোধে তিনি পরমেশ্বরী হতে ন্যূন নন কোন অংশে বরং শ্রেষ্ঠ। আবার এক-হিসাবে তাঁর দুয়ারে তিনি চিরদিনের ভিখারী এ-ও আছে। বিলাস-বিবর্ত এইটিই। অথচ সবার উপরে নিত্য ভাস্বর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ব্রাহ্মীস্থিতির অচল প্রতিষ্ঠা।

জ্ঞান ও প্রেমের পারম্যে সত্যই তাঁর মাহেশ্বর্য সিদ্ধ কি না শ্রীনিগমানন্দকে জগদ্‌গুরুর কাছে তার পরীক্ষাও দিতে হয়েছে। হ্যাঁ, এই জগতে এই দেহে। তবে না জীবনমুক্তি, তবেই শৈব বেদান্তের 'মহামাহেশ্বর' অভিধা অন্বর্থ।

গারোহিলে তাঁর সিদ্ধজীবনে সেই পরীক্ষার সন্ধিক্ষণ এল। প্রকট প্রকাশে পরমেশ্বরী ব্রহ্মকল্প পুরুষের সন্নিহিত হলেন। অপরোক্ষানুভবে শ্রীনিগমানন্দ প্রত্যক্ষ করেন পরমাপ্রকৃতি যুগপৎ তাঁর দুহিতা ও জায়া। একদিকে তাঁরই আত্মজা, তাঁর লালনব্যগ্রা শিশুকন্যা সে, ভাবের পরিণতিতে সেই তাঁর আত্মসমা দয়িতা। বিশ্বপ্রকৃতিকে গুরুভাবে পরিণামিত করার দায় সেদিন তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন। আর শুধু কি তাই? স-চমকে শ্রীনিগমানন্দ দেখেন তাঁর জায়ারূপে যিনি অর্দ্ধাঙ্গিনী তিনিই আবার জননী—পুরুষের গর্ভধারিণী প্রসূতি। অথচ ওই প্রসূতি তাঁর রমণীও—মধুর রসের একমাত্র আলম্বন!

এ যে 'নিস্ত্রৈগুণ্যে' উত্তীর্ণ হওয়ার কী কঠিন পথ, সংস্কারভেদনের

কোন্ অদ্বয়বজ্র—ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে তা বুঝবে না। কথায় শুধু কথা বাড়ে।

জ্ঞান ভাবসিদ্ধ হবে, ভাব জ্ঞানসিদ্ধ। তবে 'কাঁচা আমি' খসে গিয়ে 'পাকা আমি' নিয়ে এই দেহে জীবের শিবত্ব। সেদিন শ্রীনিগমানন্দের তা-ই হল।

পুরুষোত্তমের এক নাম 'মাধব'। আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতিই মা, তিনি হরি-হর-বিরিঞ্চিরও প্রসূতি। এই জগদম্বাকে পত্নীজ্ঞানে গ্রহণের পৌরুষ যাঁতে প্রতিষ্ঠিত তিনিই 'মা-ধব'।

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিতে এ কাহিনীর বহুল প্রচার—

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার ছায়া
পরাৎপরা পরমপ্রকৃতি।
অনির্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি ॥
অচক্ষু দেখিতে পান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি ॥

তাঁর গর্ভপ্রসূত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব কারণার্ণবে তপস্যা করছেন। মা তাঁদের তিনজনকে পরীক্ষা করতে এলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু তাঁকে পত্নী রূপে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু 'শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই', তিনি গ্রহণ করলেন। এই নিরঞ্জন গুরুতত্ত্বই 'সদগুরু' বা 'পুরুষোত্তম'রূপে প্রখ্যাত।

এবার মিলিয়ে নেওয়া যাক, 'জননী এসে মধুরে আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। পুরুষোত্তমের তুর্যাতীত ভাব হৃদয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে নিগমানন্দ সেই অবস্থাতে সমাহিত হলেন'।

'নিদানকথায়' তাই মন্তব্য করা হয়েছে বিজ্ঞানভৈরব মহা-মাহেশ্বরের মধ্যে 'প্রজ্ঞা শক্তি আর প্রেম এক যৌগিক বিগলনে এক হয়ে 'যায়।' এই যোগ পুরুষোত্তমের 'সিদ্ধিযোগ' প্রাকৃতে অপ্রাকৃতের পূর্ণ আবেশ।

'শ্রীনিগমানন্দের জীবন এই লক্ষণাক্রান্ত'।

সদ্গুরু শ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব

সদ্গুরু কে? জ্ঞান পথে সিদ্ধ নির্বিকল্পব্যুত্থিত পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ সদ্গুরু হতে পারেন না। সৎ শব্দ গুরুর বিশেষণ নয়, সদ্গুরু এক কথা। একমাত্র সদ্গুরুই অপরকে কৃপা করতে পারেন। (জীবনী বানী)

শিক্ষার প্রতি পর্বেই গুরু বা জ্ঞান লাভের জন্য একজন দিশারী অর্থাৎ পথপ্রদর্শক চাই। যিনি পরম তত্ত্বের জ্ঞান দান করে শিষ্যকে সেই পরমপদে আরূঢ় হওয়ার পথ দেখান তিনিই সদ্গুরু বা গুরুব্রহ্ম। 'সৎ' শব্দ বেদে ব্রহ্মবাচী। সুতরাং গুরু আর সদ্গুরু একার্থক নয়। শ্রীনিগমানন্দ সদগুরু কেন? তিনি জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধ হয়ে নির্বিকল্প বুত্থিত পুরুষ বলেই সদ্গুরু-পদবাচ্য।

সুপ্রাচীন কাল হতে ভারতে জ্ঞানপন্থার সাধনশাস্ত্র হল যোগ। তার মধ্যে আবার তিনটি প্রধান—বৈদান্তিকের ধী-যোগ, সাংখ্য মতাবলম্বীর রাজযোগ ও তান্ত্রিকের হঠযোগ। ধী-যোগে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন, রাজযোগে আসন প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ এবং হঠযোগে ষট্-কর্ম সাধন ও কুণ্ডলিনী উত্থাপন। সদ্গুরু নিগমানন্দ তাঁর জ্ঞান ও যোগ শিক্ষাদাতা পরমহংস সচ্চিদানন্দ সরস্বতী ও মহাযোগী সুমেরদাসজীর কাছ হতে পাঠ নিয়ে একত্রে এই তিনটি যোগের গুহ্য সাধন প্রণালী অবলম্বনে বেদান্তোক্ত নির্বিকল্প অবস্থা লাভ করেন। যোগদর্শনের ছাত্র মাত্রেই জানেন অষ্টাঙ্গ যোগের শেষপর্ব সমাধিও একটি সাধনাঙ্গ মাত্র। সমাধিস্থ হলেই যে তার স্বরূপাবস্থা লাভ হয়েছে এ-ধারণা সত্য নয়। সমাধির বহু ভেদ আছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম বেদান্তোক্ত নির্বিকল্পাবস্থা। কেন, তা সংক্ষেপে বলা যাক। হঠযোগের কুণ্ডলিনী উত্থাপনে জ্ঞানপন্থী চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে প্রকৃতির মায়াজাল ছিন্ন করে মহাশক্তির অধিকারী হন। তখন তিনি সহজেই

সমাধি সহায়ে পুরুষতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব অবগত হতে পারেন। এই অবস্থাটি পাতঞ্জল দর্শনে নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত বলে বর্ণিত হয়েছে। তন্ত্রের পরিভাষায় এটি পরমাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার এবং সমাধির অতি উচ্চাবস্থা। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে বেদান্তের নির্বিকল্পাবস্থাও বলা যায়। কিন্তু সাধন প্রণালীর ভিন্নতা হেতু দুইয়ে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে।

সাংখ্যের বিচার এক ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে। এজন্যে সাংখ্যযোগীর ঈশ্বর ও বেদান্তীর ভগবানে পার্থক্য আছে। সমাধির চরমাবস্থায় সাংখ্য-যোগী যখন পুরুষতত্ত্বে লয় হন তখন তিনি কৈবল্য লাভ করেন—সে অবস্থা অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ অনির্বাচ্য অব্যক্ত সে অবস্থা। সাধারণত তাঁর ব্যুত্থান হয় না। যদি হয়, তবে তা আধিকারিক পুরুষের বুত্থান। যিনি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি তা জানেন তিনি কেবলী বা মুক্ত পুরুষ। সাধারণত আচার্য বা প্রবক্তা হওয়ার অধিকার নিয়েই তিনি জগতে ফিরে আসেন।

সাংখ্যের বিচার ব্যষ্টি নিয়ে, বেদান্তের বিচার সমষ্টি নিয়ে। একটিতে এক ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব জানা যায়; অন্যটিতে জানা যায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের খবর। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান মূলে এক অদ্বৈত তত্ত্বেরই প্রকাশ। সাংখ্যাচার্য আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মাকে জানেন বলে বেদান্তীর নির্বিকল্প ভূমির তত্ত্বও তিনি অবশ্যই বোঝেন। তবু শাস্ত্র মতে তিনি বেদান্তোক্ত নির্বিকল্পবুত্থিত মহাপুরুষ নন। বেদান্তের ক্ষেত্র অতি ব্যাপক বলে বৈদান্তিকের নির্বিকল্প ভূমিও সমাধির পরম ও চরম সীমা। 'ইহার উপরে নাই'।

শ্রীনিগমানন্দ ক্রমান্বয়ে একদিন, তিন ও সাতদিন, সবীজ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সহায়ে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সাক্ষাৎ করে পুরুষ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা অর্জন করেন। তারপরই সমাধি তাঁর সহজাবস্থা হয়ে যায় (জীবনী ও বাণী পৃঃ ৪২)। তখন তিনি বেদান্ত নির্দেশিত নির্বিকল্পাবস্থা লাভে কৃত সংকল্প হয়ে রাজযোগ ছেড়ে ধী-যোগ অবলম্বন করে নিদিধ্যাসনের পথ ধরলেন। নির্বীজ

বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হ'তেও যোগী ফেরেন—পাতঞ্জলেই তার উল্লেখ আছে। কিন্তু বেদান্তের নির্বিকল্প ভূমি হতে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই বললেই হয়। বেদান্তদর্শনে বলাই হয়েছে সেখানে হতে 'ন পুনরাবর্ত্ততে'—আর সে ফেরে না।

শ্রীনিগমানন্দ বেদান্তের নির্বিকল্প অবস্থার যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা তাঁর নিজের হাতে লেখা নয়। তাঁর অন্তেবাসীদের স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত, তাঁর বাণী-সংকলন। তবুও বলতে হয়—এমন সহজ ভাষায় বেদান্ত দর্শনের সর্ব্বোচ্চ ভূমির বর্ণনা কোনও দিন আর কোনও মহাপুরুষ দিয়েছেন বলে আমরা জানি না। যদি বৈদিক পরিভাষায় তার ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া হয় সাধারণে বিন্দু মাত্র মর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই তাঁরা কেবল এইটুকু বিশ্বাস করলেই যথেষ্ট হবে যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছাড়া গত বারশত বৎসরের মধ্যে এ-ভূমির সংবাদ অন্য কেউ পান নি। অষ্টম শতকে আচার্য্য শঙ্কর এই নির্বিকল্পের সংবাদ এনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত উপদেষ্টা তোতাপুরী বা শ্রীনিগমানন্দের জ্ঞানীগুরু সচ্চিদানন্দ সরস্বতী সমাধি-সিদ্ধ বটে। কিন্তু তাঁরা বেদান্তের বিচার পথ অবলম্বন করায় শ্রীনিগমানন্দের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে শ্রীনিগমানন্দ জ্ঞানমার্গীর সাধনশাস্ত্র যোগবিদ্যার ত্রিস্রোতায় একাধারে অবগাহনান্তে নির্বিকল্পে উপনীত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাই। এজন্য সিদ্ধপুরুষ তোতাপুরী ও সচ্চিদানন্দ সরস্বতী উভয়েই ধর্মতঃ গুরু হলেও তাঁদের শিষ্য-পদবাচ্য শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীনিগমানন্দকে নিজেদের চেয়ে বড় বলে মান দিয়েছেন। "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।"

শ্রীনিগমানন্দের স্বরূপ পরিচয়—

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই হল বেদবিদ্যার নিগূঢ় মর্ম বা নিগম তত্ত্ব। ব্রহ্মচারী নলিনীকান্তকে বেদার্থ-বিজ্ঞানের উত্তমাধিকারী জ্ঞানে তাঁর জ্ঞানীগুরু তাঁকে ওই স্বরূপ পরিচয় প্রদান করেন। 'গুরু এক

বই দুই নাই'—অবতার পুরুষের বাণী। জগদ্‌গুরুর ইচ্ছায় জ্ঞানসিদ্ধ সচ্চিদানন্দজী নলিনীকান্তকে যে-স্বরূপ প্রদান করলেন তার প্রকৃত অর্থ যে কত ব্যাপক তা নলিনীকান্ত নিজেও প্রথমে জানতেন না।

বৃঃ আঃ উপনিষদ্ হতে জানি 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এই মহাকাব্য স্বয়ং ব্রহ্মেরই আত্মবোধ। সুতরাং এ জগতে যিনি ওই মহাবাক্যের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন তিনি 'দেবতাদেরও আত্মা'। অর্থাৎ দেবতাদের চেয়েও তিনি বড়। 'তিনি সব হন'। শিবাবতার ঋষি বামদেব বৈদিক যুগে একমাত্র পুরুষ যিনি ওই মহাবাক্যের প্রকট বিগ্রহ (বৃ. আ. উ ১।৪।৩০)। শ্রীনিগমানন্দের সন্ন্যাস দীক্ষাকালে মহাবাক্য ছিল 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। যোগ সিদ্ধির পরম সীমা বেদান্তের নির্বিকল্প ভূমিতে আরূঢ় হয়ে শ্রীনিগমানন্দ ওই ব্রহ্মঘোষের অপরোক্ষানুভব লাভ করেন। অতএব শ্রুতি প্রমাণে তিনি সাক্ষাৎ 'নরাকার পরব্রহ্ম'।

শ্রুতি দ্বিবিধা—বৈদিক ও তান্ত্রিক (হারীত-ধর্মসূত্র)। তন্ত্রমতে আগমের প্রবক্তা শিব ও শ্রোত্রী শিবানী স্বয়ং। আর 'নিগম' হল সেই পরাবিদ্যা যা 'গিরিজা বক্ত্র হতে গিরিশের শ্রুতিগোচর হয়'। এটি রহস্যোক্তি মর্ম অতি নিগূঢ়। অর্থাৎ, 'নিগম' তত্ত্ববিদ্যার সাধ্য-শিরোমনি।' 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। মহামহেশ্বরী যাঁকে বরণ করেন সেই সাক্ষাৎ শিব ভিন্ন তা অপরের সাধনীয় বা শ্রোতব্য নয়।

জীবের শিবত্ব লাভ হল উত্তরণ ধারা। গুরু এই উত্তরণ ধারার ধারক। 'নিগম' হল নির্গমনের পথ। এ জগতে শিবকল্প পুরুষ শ্রেষ্ঠকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন স্বয়ং ভগবতী। তাই যদি হয়, তাহলে বলতেই হবে পরমাপ্রকৃতি স্বয়ং যাঁকে এভাবে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান মূলে তিনি জগদ্‌গুরু শিবতত্ত্ব। জগৎচক্রে প্রবেশের পূর্বেই তিনি গুরুরূপে চিহ্নিত থাকেন।

স্বপ্নে বধূবীজ পেয়ে তারাপীঠে ত্রিপুরেশ্বরীকে দর্শন করে 'মায়ের

কৃপায়' শ্রীনিগমানন্দের সাধন জীবনের সূত্রপাত। সুতরাং যদিও তিনি বলছেন 'আমি অবতার নই—তোমাদের মত সাধারণ মানুষ। জন্মজন্মান্তরের সাধনায় এবার পূর্ণত্ব লাভ করেছি' (জী. বা.)। তবুও বলব কল্প প্রভাতেই তিনি 'শিবাঙ্কুর' (যেমন 'বুদ্ধাঙ্কুর') বলে চিহ্নিত ছিলেন। এই অর্থেও তিনি 'নিগমানন্দ বটে—নিগমার্থগোচরকরী'র সদানন্দ স্বরূপ ভর্ত্তা, স্বয়ং গুরুব্রহ্ম।

শ্রুতির পর স্মৃতি—প্রমাণ। বেদবিভাগ-কর্ত্তা বেদব্যাস সংকলিত মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত 'পারমহংস সংহিতা' অর্থাৎ পরমহংসবেদ্য মন্ত্রমালা—পঞ্চম বেদ। এই ভাগবতে নিগম তত্ত্বের পরিচয়

'নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমঃ নমঃ॥ (ভাঃ ১০।১৬।৪৪)

ভাগবতে ব্রহ্ম৷ আত্মা ও ভগবান একার্থবাচী—অদ্বয় পরতত্ত্ব। শ্রীনিগমানন্দ বৈষ্ণব মহজনকে সমর্থন করে বলেছেন—সূর্য-বিচ্ছুরিত অনন্ত জ্যোতি যেন ব্রহ্ম, সূর্যমণ্ডল যেন আত্মা আর সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষ ভগবান—একই তত্ত্বের ত্রিবিধরূপ সচ্চিদানন্দ-ময়, সচ্চিদানন্দ-ঘন ও সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ। ব্যাসদেবের শ্রীকৃষ্ণ এই সচ্চিদানন্দ ঘন-বিগ্রহ জগদগুরুর 'মানুষী তনু'। সাধারণ অবতারের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। কারণ তিনি পূর্ণতম অবতার, একাধারে অবতার ও সদ্‌গুরু। উপরোক্ত শ্লোকটিতে তাঁকে বলা হচ্ছে 'তুমি জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি প্রমাণমূল্য ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়'। অতএব তুমি ক্রান্তদর্শী-'কবি'। তোমার জ্ঞান ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ—'অতীন্দ্রিয়'। সুতরাং তুমিই 'শাস্ত্রযোনি'—সর্বশাস্ত্র প্রবক্তা। জীবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পথের একমাত্র দিশারী, হে ভগবান! তোমারই এক স্বরূপ হল 'নিগম'। একাদশ স্কন্ধে পরম ভাগবত (প্রিয়শিষ্য) উদ্ধবকে সম্মার্গ অর্থাৎ নিবৃত্তি পথ বা ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কি তা বোঝাতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'পন্থা মৎ নিগমঃ স্মৃতঃ'—মৎ প্রদর্শিত এই পন্থাই 'নিগম' নামে বিশ্রুত।

সদ্‌গুরু নিগমানন্দের মুখেও অন্তেবাসীরা শুনলেন 'শাস্ত্র বিহিত সদাচারের পথই রাজপথ—তোমরা এই পথ ধরে চলে যাও।' তিনি সহজে নিজের মহিমা প্রকট করতেন না বলে, সব সময় বলতেন না যে এইটাই 'মৎপন্থা'। কিন্তু তাঁর আশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসীদের তিনি বিশেষভাবে যে-সব আদেশ উপদেশ দিয়েছেন তা-ই আমাদের শাস্ত্র ও সাধন পদ্ধতি। কারণ নিগম স্বরূপ যিনি, তিনি ক্রান্তদর্শী (ত্রিকালজ্ঞ) 'কবি' ও 'শাস্ত্রযোনি'। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠাশ্রমে তাঁর প্রবর্ত্তিত নিয়মই 'নিগম-পন্থা' - নিবৃত্তি পথে অদ্বয় তত্ত্বে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ। সর্বশেষে উদ্ধৃত করব একটি ব্যাসবাক্য—

ভবভয়মপহর্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ ভৃত্যবর্গান্ পুরুষমৃষভবাদ্যং
কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥ (১১।২৯।৪১)

পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ ভাগবতে 'শ্রীকৃষ্ণ' বললে সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহের মানুষীতনু বোঝায়—ব্যাস ও শুকদেব বার বার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। শ্রীনিগমানন্দ 'যোগীগুরু'তে 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞাটির ঠিক সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। এই বিচারে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি শ্রীনিগমানন্দও সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ ভগবানের মানুষী বিগ্রহ—উপরোক্ত শ্লোকটি অবতার পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, শ্রীনিগমানন্দ সম্বন্ধেও তেমনি প্রযোজ্য। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন 'ভব' হল সংসার, 'ভয়' হল জরারোগাদি নিমিত্ত ভয়। নিবৃত্তিমার্গী চায় ভববন্ধন মোচন, প্রবৃত্তিমার্গী আর্ত চায় জরা ব্যাধি ভয় হতে পরিত্রাণ। সমুদ্র মন্থনে অমৃত আহরণের মত যিনি সাধনশৌর্যে ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়মণ্ডল হতে জ্ঞান-বিজ্ঞানসার 'অমৃত' আহরণ করেন এবং ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে সেই ভাবে যিনি বিভিন্ন আচার্য হতে সর্বোপনিষদসার গুরুভক্তি রূপা 'দেব মধু' সুধা আহরণ করেন, তারপর অপক্ষপাতে নিবৃত্তি ও

প্রবৃত্তি মার্গী নিজ ভৃত্যবর্গকে প্রয়োজনানুরূপ ওই অমৃত ও সুধা যিনি পান করান, তিনিই নিগমকর্তা আদিপুরুষ বা সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী মহাপুরুষ। সেই 'কৃষ্ণ সংজ্ঞ' গুরু নারায়ণকে প্রণাম।

শ্রীনিগমানন্দও রূপকচ্ছলে কি বলেননি 'অধ্যাত্মজগতে সংসারী হয়ে সাধনারূপ পত্নীর গর্ভে আমি জ্ঞান ও ভক্তিরূপা দুটি পুত্র কন্যা লাভ করেছি'? বলেননি 'তোরা আমার কাছে আসবি বলে তোদের হয়ে যে আমিই কঠোর তপস্যা করেছি। তোদের তরে সাধন সমুদ্র মন্থন করে অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে এসেছি***।' সাধকাবস্থায় নিগমানন্দ 'নিগমে'র সিদ্ধশ্রোতা শিবকল্প পুরুষ। সিদ্ধদশায় নিগম-কর্তা সাক্ষাৎ 'পুরুষোত্তম'। তাঁর উদ্দিষ্ট মত ও পথই সারস্বত সংঘের 'নিগম বাণী' বা 'জ্ঞান-বিজ্ঞানময় বেদসার'।

কেবল নিগমানন্দ নামটির তত্ত্ব বিচার করতে গেলেই এত কথা ওঠে। এরপর আছে তাঁর 'পরমহংস সংজ্ঞা'।

পরমহংস কে?—সন্ন্যাসাশ্রমীর সিদ্ধাবস্থাকেই পরমহংসত্ব বলা হয়। যিনি সমাধিযোগে ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করেছেন সামান্যার্থে তিনিই 'পরমহংস'। বেদান্ত বলেন তিনি দণ্ডাদি সন্ন্যাস চিহ্ন পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হলেও তাঁর প্রত্যবায় হয় না। তিনি ত্রিগুণাতীত। এই বিচারে সচ্চিদানন্দজীও পরমহংস—কারণ তিনি বিচার পথে ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধি করেছিলেন। আর শ্রীনিগমানন্দ যখন কামাখ্যা পাহাড়ে বেদান্তোক্ত নির্বিকল্প ভূমি হতে প্রত্যাবর্তিত হলেন তখনই তিনি পরমহংস পদবীতে আরূঢ়। কিন্তু তিনি দণ্ডাদি ত্যাগ করলেন না—চললেন জ্ঞানীগুরুর কাছে। তাঁর জ্ঞানপিপাসা বা জিজ্ঞাসা তখনও অতৃপ্ত। পুষ্করে যাওয়ার পথে--তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের সূত্রপাত হয় যে কাশীধামে সেইখানে একবার নেমেছিলেন। তার মূলেও সেই জিজ্ঞাসা। সচ্চিদানন্দজী বা সুমেরদাসজীর কৃপায় যা পেলেন তাতেও তাঁর প্রাণের হাহাকার যায়নি। কাশী বরাবরই

সাধু সমাজের বিখ্যাত কেন্দ্র—শঙ্কর পন্থী কোন সিদ্ধ পুরুষ দেখে তাঁর সঙ্গে নিজের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শ্রীনিগমানন্দের প্রায় প্রত্যেকটি প্রচলিত জীবনীতে আছে নিগমানন্দ কামাখ্যা হতেই কুম্ভ মেলায় যান এবং শৃঙ্গেরী মঠের শংকরাচার্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সচ্চিদানন্দজীর আদেশে দণ্ড ত্যাগ করে যথাশাস্ত্র 'পরমহংস' পদে আরূঢ় হন। তারপর আসে তাঁর ভাব সাধনার পর্ব। শ্রীনিগমানন্দের সাধনজীবনের এই ক্রম স্বীকার করলে একদিকে যেমন তাঁর তত্ত্ব সম্যক ধারণা করা যায় না—অন্যদিকে তাঁর পরমহংসত্বের বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হয়। মহাযোগী সুমেরুদাসজী, জ্ঞান সিদ্ধ সচ্চিদানন্দজীও যোগী এবং সন্ন্যাসী সমাজে 'পরমহংস' মহাকৌল ব্রহ্মানন্দ গিরিও পরমহংসত্ব লাভ করেছিলেন। তাহলে এঁদের সঙ্গে শ্রীনিগমানন্দের প্রভেদ কোথায়?

সমস্ত বিতর্ক বাদ দিয়ে বলব, তা ছাড়া ওই ধারণাটাই ভুল যে শ্রীনিগমানন্দ পরমহংসত্ব লাভ করার পর ভাবসাধনাদি ও গারোহিল পর্ব সম্পন্ন হয়। শৃঙ্গেরী মঠের জগদগুরুর অনুমোদনে সচ্চিদানন্দজী সাধুমণ্ডলীর অনুমতি গ্রহণ করে এলাহাবাদ কুম্ভে শ্রীনিগমানন্দের হাত হতে দণ্ড নিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে ভাসিয়ে দেন এটা সকলেই বলেছেন। এলাহাবাদ কুম্ভ হয়েছিল ১৩১০ সালে—যোগীগুরুর ভূমিকায় শ্রীনিগমানন্দ স্বয়ং লিখেছেন—"এলাহাবাদ কুম্ভমেলা দর্শনে গমন করিব, এই জন্য তাড়াতাড়ি কপি লিখিয়াছি, সুতরাং ভুল অবশ্যম্ভাবী।" এই ভূমিকায় তারিখ আছে ১০ই পৌষ বড়দিন ১৩১১ সাল—তার আছে গারোহিল যোগাশ্রমের নাম। এই সময় শ্রীনিগমানন্দ মাহেশ্বরীর নির্দ্দেশে লোকশিক্ষার দায় নিয়ে গহন গিরি-অরণ্য ছেড়ে আবার লোকসমাজে ফিরে এসেছেন। ভাবসাধনার পরমাসিদ্ধি, তখন তাঁর করামলকবৎ। তারাপীঠে যাঁর কৃপাকে ঠাকুর 'মায়ের কৃপা' বলেছেন, সেই পরমেশ্বরী তখন তাঁর দাসী সেবিকা-প্রিয়া হয়ে ধরা দিয়েছেন। অতএব শ্রীনিগমানন্দ তখন 'মাধব' অর্থাৎ

মা - জগদম্বারও স্বামী, নিত্যলোকের পুরুষ। তিনি তখন সত্যই অমূর্ত ব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ স্বয়ং পুরুষোত্তম।

যোগীগুরুর প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদনান্তে আছে শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, উপনামে স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক। শ্রীমৎ যোগানন্দজী লিখেছেন, যোগীগুরু প্রেসে দিয়ে ঠাকুর এলাহাবাদ কুম্ভে চলে যান। সেখানে সাধুমণ্ডলীর মাঝখানে শৃঙ্গেরী মঠের মোহান্ত জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজ তত্ত্বোপলব্ধির পরিচয় প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং যখন বললেন, 'এ বাচ্চা তো পরমহংস হ্যায়', তখন সচ্চিদানন্দজীর আদেশক্রমে ঠাকুর মহারাজ যথাবিধি দণ্ড কমণ্ডলু ত্যাগ করেন। পরে কলিকাতায় ফিরে প্রেসে গিয়ে উপনাম অংশটুকু যোগ করে দেন। দ্বিতীয় সংস্করণ হতে ছাপা হয়—'ভক্তপদারবিন্দভিক্ষু দীন নিগমানন্দ।'

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পরমহংস নিগমানন্দদেবের মহিমা যেমন পরিস্ফুট হয়, ভ্রান্ত তথ্য-সম্বলিত জীবনীতে তা হয় কি? প্রথম লক্ষণীয় বিষয়—শ্রীনিগমানন্দের বিরাট তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। পরমহংসোপনিষদের বা প্রচলিত বেদান্ত মতের সর্বোচ্চ সোপানে আরূঢ় হয়েও নিজেকে তিনি 'আপ্তকাম আত্মারাম' মনে করতে পারলেন না। তাঁর সেই সত্যৈষণার ফলে স্বয়ং জগদীশ্বরী আবির্ভূতা হয়ে স্পষ্টই বললেন, 'তুমি এখনও অপূর্ণ পরব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হয়েছ। কিন্তু ভগবতত্ত্ব তোমার ধারণা হয় নি।' নিজের মনে এতটুকু সংশয়ের অবকাশ থাকা পর্যন্ত সত্যব্রত নিগমানন্দ নিজেকে সিদ্ধপুরুষ বা পরমহংস মনে করেন নি। দণ্ডত্যাগও করেন নি।

যাই হোক, কাশী হতেই তিনি ভাব সাধনার নির্দেশ পেয়ে সিদ্ধা যোগিনী গৌরীমার সঙ্গে দেখা করেন। তখন অপ্রাকৃত লীলাজগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল তাঁর সামনে। প্রথমে গৌহাটি যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসের বাড়িতে পরে গারোহিল যোগাশ্রমে ভাব-সাধনায় সিদ্ধ হয়ে তিনি যখন একসঙ্গে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের তত্ত্ব সম্যক অবগত হলেন

তখন তিনি পূর্ণস্বরূপ লাভ করে'পর-অবর সব—পরাবর ব্রহ্মই হয়ে গেলাম'—বলবার অধিকার লাভ করলেন।

পরমহংসোপনিষদাদি 'ব্রহ্মজ্ঞান বিশুদ্ধ' সন্ন্যাসীকে 'ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতি প্রমাণে পরমহংস আখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু বেদবিভাগকর্ত্তা নারায়ণস্বরূপ গুরু বেদব্যাসের সংকলিত যে শ্রীমদ্ভাগবত পরমহংস সমাজে বেদ-বেদান্তের শেষ পর্ব বলে 'পারমহংস্য সংহিতা' নামে সমাদৃত, সেখানে পরমহংস বস্তুত জগদ্‌গুরুর সংজ্ঞা— 'নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভৃতাত্মনে।'—শ্রীধর স্বামীর টীকায় আছে, 'যিনি নিজ তেজে বিশ্বব্যাপী (পূর্ণ) এবং ক্ষয় বৃদ্ধি শূন্য (নিভৃতাত্মা) সেই সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থ মহাপুরুষই পরমহংস।

অন্যত্র পাই—ওঁ নমো নারায়ণ পুরুষায় মহাত্মনে বিশুদ্ধ সত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহী॥ ঈশ্বর শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবান বিশুদ্ধ সত্ত্ব। বিশুদ্ধসত্ত্বের আশ্রয় 'মহাহংস'ই (অর্থাৎ পরমহংস—স্বামীকৃত টীকা) জীবের ধ্যেয়। ষষ্ঠ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে পরমহংসতত্ত্ব আরও পরিস্ফুট করে ভাগবত প্রবক্তা বলছেন -

নমস্তুভ্যং ভাগবতে সকল জগৎ স্থিতিলয়োদয়েশায়।

দুরবসিতাত্মগতয়ে কুযোগিনাং ভিদা পরমহংসায়॥ (৬।১৬।৪৬)

কুযোগীদের পক্ষে যাঁর তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়, যিনি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা —সেই পরমহংস স্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রণাম

ব্যাসপুত্র শুকদেবের উপদেষ্টা রাজর্ষি জনকের গুরু ব্রহ্মবিদ-বরিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বৃ.আ.উ-এ ঘোষণা করেছেন ব্রহ্মোপলব্ধির পরমপর্বে তিনি অনুভব করলেন "পরমাত্মা তাঁকে প্রিয়া স্ত্রীর মত আলিঙ্গন করেছেন।" তাঁর চিদাকাশ (সেই) স্ত্রীরূপে পরিপূরিত। সমগ্র সংহিতায় আর উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য পরতত্ত্বকে যে ভাবে পেয়েছিলেন এ যুগে শ্রীনিগমানন্দও ঠিক যেন সেই ভাবে ভগবানকে লাভ করে বললেন, "জ্ঞানের সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞান যখন ঘন-বিগ্রহরূপে দেখা দেবে, তখনই ঠিক জ্ঞান লাভ হয়েছে বুঝতে হবে। এরই নাম ব্রহ্মদর্শন।

ব্রহ্মকে দর্শন না করা পর্যন্ত প্রাণের হাহাকার মিটে না" (জীবনী ও বাণী)। আজ আমরা সকলেই জানি ভাবের সাধনা করেই শ্রীনিগমানন্দ পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তখন সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহরূপে শ্রীনিগমানন্দ যাঁকে দর্শন করেছিলেন, তিনি সুধাংশুবালার ঠাকুরাণী রূপ ধরেই তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হতেন।

আবারও বলব 'ইহার উপরে নাই'। আর এই জন্যই শ্রীনিগমানন্দ হলেন 'সিদ্ধের সিদ্ধ' (শ্রী রা. ক. ৩।১।২)। 'প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়' (তাঁর) (শ্রী রা. ক. ৩।১।২)।

অর্থাৎ আমরা জানব কেবল প্রচলিত অর্থে শ্রীনিগমানন্দ পরমহংস নন। চতুর্থাশ্রমীর সেই শ্রেষ্ঠ পদ কামাখ্যাতেই তাঁর অধিগত হয়েছিল। তারপর পরমেশ্বরীর নির্দেশে তিনি এগিয়ে গিয়ে যে-ভূমির খবর পেয়েছিলেন তার খবর খুব কম পরমহংসই জানেন। অতএব জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি তিন পথের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে শ্রীনিগমানন্দ যে পরমহংসত্ব লাভ করেছিলেন তা শ্রীমদভাগবতের নির্দেশিত পরমহংসত্ব বা পূর্ণব্রহ্ম- সনাতন ভগবৎ স্বারূপ্য।

শ্রীনিগমানন্দ কেবল নির্বিকল্প বুত্থিত হয়েই সাধু মহাসম্মেলনে পরমহংস পদবী পেয়েছিলেন —ভাবসাধনা করেছিলেন তারপরে, তাঁর সাধন জীবনের এই ক্রম দেখালে তাঁর 'পরমহংস' পদবীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না কিন্তু বিশ্বেশ্বরী যে তাঁকে বরাবর ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত করে তারপর যথাশাস্ত্র ও যথাবিধি শৃঙ্গেরী মঠের (সরস্বতী সম্প্রদায় যে মঠের অধীন) তৎকালীন জগদ্গুরু শংকরাচার্য দ্বারা পরীক্ষান্তে গুরুপিতা সচ্চিদানন্দ সরস্বতীকে দিয়ে দণ্ডাদি চিহ্ন ত্যাগ করিয়ে শ্রীনিগমানন্দকে পরমহংস স্বীকৃতি দিলেন এতে তাঁর 'নিগমানন্দ পরমহংস' এই স্বরূপ পরিচয় প্রস্ফুট হয় সাধনার আদ্যন্ত স্বয়ং মাহেশ্বরী তাঁর হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন সগুণ-নির্গুণের সন্ধিভূমি এবং সচ্চিদানন্দ ঘন-বিগ্রহ নিত্যপুরুষের ভগবৎধাম বা নিত্যধামে।

দ্বিতীয়তঃ কেবল জ্ঞানসিদ্ধ হয়ে নয়, ভাবসিদ্ধির পরে শ্রীনিগমানন্দ সমাজে পরমহংস স্বরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করেন, এ কথা শ্রীনিগমানন্দের অখণ্ড দর্শন ও অটল গুরুভক্তির পরিচায়ক। জ্ঞান-যোগভক্তি ত্রিবিধ সাধনায় যুগপৎ ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানের স্বরূপ জেনে শ্রীভগবানকে নিয়ে ঘর করেও শ্রীনিগমানন্দের দণ্ডকমণ্ডল ত্যাগ করে পরমহংস-সুলভ যথেচ্ছা বিচরণে মতি হয় নি। তিনি জেনেছিলেন 'ব্রহ্ম চতুষ্পৎ'। তূর্যাতীত ভূমিতে গিয়ে তিনি অখণ্ডমণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতি পারাবারে নির্বাণাবস্থা আস্বাদ করে এলেন তূরীয় বা মহাকারণে 'আমি গুরু' এই বোধে প্রতিবিদ্ধ হলেন। তারপরই নির্গুণ ও সগুণের সন্ধিভূমি বা ভাবলোকের দুয়ার খুলে গেল তাঁর সম্মুখে। দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থিত হয়ে তিনি এ ভূমিও যখন সাক্ষীভাবে দর্শন করলেন তখন কারণে ও সূক্ষ্মে তাঁর 'নির্গুণ ব্রহ্ম' বা 'গুরুভাব সিদ্ধ হয়ে গেল। স্বয়ং মাহেশ্বরী তাঁকে অনুরোধ করলেন 'তুমি লোকালয়ে গিয়ে গুরুদায় স্বীকার কর।'

শ্রীনিগমানন্দ তখন কেবল কলম ধরলেন, না করলেন দণ্ড ত্যাগ না দিলেন কাউকে দীক্ষা। তাঁর দৃঢ় পণ, স্থূলে যিনি গুরুরূপে সন্ন্যাস-প্রদান করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বয়ং না অনুজ্ঞা করছেন—'তুমি পরমহংসত্ব লাভ করেছ। সুতরাং আজ হতে আমার গুরুদায় তোমারই হল'—ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন মতেই স্থূল জগতে 'গুরুভাবে' ক্রিয়াশীল হবেন না। এইটাই অখণ্ড দর্শন (Integral view) এবং এইটিই শ্রীনিগমানন্দের -'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মহাজ্ঞানের বাস্তব পরিচয়। সত্য যতক্ষণ পর্যন্ত চতুষ্পাৎ রূপে প্রত্যক্ষ হয়ে তুর্যাতীত ভূমির পরতত্ত্বকেই প্রকট না করে ততক্ষণ তা খণ্ডসত্য, পূর্ণসত্য নয় শ্রীনিগমানন্দের এই সত্য দর্শন আর শংকর দর্শনের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এক জিনিষ নয়। সেই জন্য শ্রীনিগমানন্দের সারস্বত মঠ— শঙ্কর পন্থীর মঠ নয়। তার মূল মন্ত্র 'শংকরের মত ও গৌরাঙ্গের পথ'

—দর্শনের ভাষায় জ্ঞান কর্মের অসমুচ্চয় নয়, জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির পূর্ণ সমুচ্চয়।

নিগম পন্থা আদি বেদান্তের সারভূত সত্য। দশোপনিষদের অন্যতম বৃ. আ. উপনিষদে যে যাজ্ঞবল্ক্য নেতিবাদ বা 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' প্রতিপাদন করেছেন, তিনিই আবার ঈশোপনিষদের প্রবক্তা হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন "ঈশাবাস্যমিদংসর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। এই বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর কর্তৃক পরিব্যাপ্ত।

শ্রীনিগমানন্দ দর্শনও একাধারে নেতিবাদ এবং ভক্তি সূত্র প্রণেতা ঋষি শাণ্ডিল্যের (ছা, উপ) ইতিবাদের সমন্বয়। সাধন দশায় জগৎ ছেড়ে মহাশূন্যে লয় হয়ে যাওয়া—তারপর স্বয়ং 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' হয়ে ফিরে এসে বলা—'স্থূল সূক্ষ্ম যত দেখ—এক ভিন্ন দুই নাই,

স্বপ্নেতে জীব-জগৎ, বৃথা খেটে মর ভাই ;

সর্বং-খলু-ইদং-ব্রহ্ম জেন নলিনে।" (জ্ঞানীগুরু)

আমাদের সারস্বত মঠাশ্রমে সকাল সন্ধ্যায় স্তোত্র বন্দনান্তে যে শান্তি পাঠ উচ্চারিত হয়—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

এটি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের ঈশোপনিষদেরই শান্তিপাঠ। শ্রীনিগমানন্দ সুস্পষ্ট নির্দেশে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অনুভূত বেদান্ত পূর্ণতম বেদান্ত—অর্থাৎ সর্বোপনিষদ সার গীতাজ্ঞানে ও ভাগবতী প্রেম-ভক্তির সংমিশ্রণে ব্রহ্মার 'জ্ঞান-বিজ্ঞান সার' নিগমতত্ত্ব।

উপসংহারে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ঋগ্বেদ সংহিতা হতেই প্রমাণ মেলে পূর্বভারতে বেদবিদ্যা প্রসারে প্রবল বাধা ছিল। কপিলাবস্তু বা বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বিহারে—কপিলাশ্রম বাংলা দেশের গঙ্গাসাগর সঙ্গমে। তারও পূর্বে শক্তিপীঠ কামাখ্যাধাম। সাংখ্য দর্শন বেদান্তের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। বুদ্ধদেব বেদ বিরোধী বলে প্রসিদ্ধ।

অর্থাৎ বাংলা, বিহার ছিল অবৈদিকদের বড় ঘাটি, আসাম তাদের সমর্থক।

বার শত বৎসর আগে—বাংলা বিহার জয় করে জগদ্‌গুরু শংকর কামাখ্যাধামে গৈরিক পতাকা উড্ডীন করতে চাওয়ায় মহাদেবী স্বয়ং তাঁকে নিরস্ত করেন। এক মহাকৌলের অমোঘ অভিচারে আচার্য্য শঙ্কর ভগন্দর ব্যাধি-কবলিত হন ওই কামাখ্যাধামেই। তিনি বিফল মনোরথ হয়ে তাঁর গেরুয়া ঝাণ্ডা প্রোথিত করলেন পুরুষোত্তমধাম শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ পুরীতে। তার ওপারে বৈদিক ভাবধারার স্রোত তখনও প্রবাহিত হল না।

এতকাল পরে বেদসার 'নিগমের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে দশনামা সম্প্রদায়ের বৈদিক সন্ন্যাসী পরমহংস শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতীদেব সিংহ বিক্রমে কামাখ্যাধাম অতিক্রম করে আসামের আরও অভ্যন্তরে শিববীর্যে প্রথিত করলেন তাঁর ত্রিশূল। আকাশে উড়ল সারস্বত মঠের গৈরিক পতাকা, স্থাপিত হল ঋষি বিদ্যালয়। আর প্রকাশিত হল আর্যশাস্ত্র গহনার্থ দীপক আর্যদর্পণ'—বেদমূলা সনাতন ধর্মের মুখপত্র।'

———

বশিষ্ঠদেব ও ঠাকুর নিগমানন্দ

১২৮৭ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীনিগমানন্দদেবের জন্ম। আর ১২৯৩ সালের শ্রাবণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। সুতরাং ভাবের দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সদগুরু শ্রীনিগমানন্দ-দেবের অচ্ছেদ্য যোগ থাকাই স্বাভাবিক। দুজনেই পশ্চিম বাংলার ব্রাহ্মণ পরিবারে এসেছিলেন এবং সমসাময়িক।

শ্রীনিগমানন্দ দেবের ভাষাতেই বলব, অবতার পুরুষ আসেন সমষ্টি মানবের জন্য। চলতি ভাবনার মোড় ফিরিয়ে একটা কোন বিশেষ ভাবের স্রোত বিশ্বসমাজে তিনি বইয়ে দিয়ে যান। আর সদ্‌গুরুর কাজ হল সেই ভাবের অনুকূলে কিছু আধারকে স্বীয় শক্তিতে অধ্যাত্মপথে উন্নীত করা। অবতার সমষ্টির জন্য যা করেন, সদগুরু ব্যষ্টি ক্ষেত্রে তাকেই রূপ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার, শ্রীনিগমানন্দ সদ্‌গুরু। উভয়ের মধ্যে যে গভীর আত্মিক যোগ আছে প্রেমিকগুরুতে শ্রীনিগমানন্দদেব স্পষ্টাক্ষরে তা নির্দ্দেশ করে গেছেন। যথা,

'ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদর্শ বর্তমান ধর্ম্মবিপ্লবকালে নিতান্ত প্রয়োজন—এই সত্য সকলের প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত না হইলে আমাদের আর মঙ্গল নাই।'

শঙ্করের মত গৌরাঙ্গের পথ অর্থাৎ ভক্তিপথে জ্ঞানলাভই এ-যুগের ধর্ম—এই হল শ্রীনিগমানন্দদেবের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেছেন, আজ বলে নয় অধ্যাত্মরাজ্যে চিরদিনই পরম সত্য হল জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়। এযুগে জ্ঞানের আদর্শ শঙ্কর, ভক্তির বিগ্রহ গৌরাঙ্গ। আর "পরমহংসদেবের জীবনে (আমরা) শঙ্কর গৌরাঙ্গের অপূর্ব মিলন দেখিয়াছি।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীনিগমানন্দদেবের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে।



ঠাকুর শ্রীনিগমানন্দ

এজন্য ভাবে পার্থক্য না থাকলেও বাস্তবে তাঁর কর্ম্মপন্থা পৃথক এবং তাঁর প্রচারিত জীবন-আদর্শও শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের অনুরূপ নয়। তার মুখ্য কারণ হল, শ্রীনিগমানন্দদেব সদ্‌গুরু। তিনি অবতার বা তৎপার্ষদ নন। সুতরাং তার কর্মপ্রণালী ও নির্দেশিত সাধনপথ অবশ্যই ভিন্ন হবে। দ্বিতীয়ত, বিধাতারই বিধানে জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য। সদ্‌গুরু নিগমানন্দের অনন্যতা অতএব স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেক অবতার ও সদ্‌গুরু মহাত্মার স্বকীয়তা আছে এবং থাকবে আবার ওই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একের সঙ্গে অপরের শ্রেণীগত ঐক্যও থাকে। যেমন, বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্যের কর্মজীবন ও আদর্শে বাস্তবে অনৈক্য থাকলেও উভয়েই জ্ঞানাবতার। এইরকম দৃষ্টিতে আমরা বলতে চাই বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে শ্রীনিগমানন্দদেবের আশ্চর্য্য মিল আছে।

শুদ্ধ আধারে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। এজন্য অবতার পুরুষরা প্রত্যেকে অনন্তভাবের আধার। কিন্তু বিশেষরা সেই অনন্ত ভাবসমষ্টি হতে দু'য়েকটি বিশেষ ভাবকে যুগ প্রয়োজনে বেছে নেন ও প্রচার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায় দেখি, তাঁর উত্তরপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দে মুখ্যত রূপ ধরেছে সার্বলৌকিক বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ। পরম উদারতায় জাতি-ধর্ম ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র পৃথিবীর অধ্যাত্ম কল্যাণ-সাধনই ছিল বিবেকানন্দের স্বপ্ন। এই জন্য সকলের কাছে তাঁকে মহাবিপ্লবীর ভূমিকায় দাঁড়াতে হয়েছিল আমেরিকায় তিনি আখ্যা পেয়েছিলেন 'সাইক্লোনিক হিন্দু'। কারণ যত প্রগতির বড়াই করুক, খৃষ্টান সমাজেও গতানুগতিকতা ও গোঁড়ামির কমতি নাই। স্বামীজির উপদেশ নির্দেশ তাব গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছিল। আর এদেশে তো কথাই নাই। বিশ শতকে ভারতে যত চিন্তানায়কই জন্মান না কেন, ভাবনার ঔদার্য্যে ও পরিকল্পনার অভিনবত্বে বিবেকানন্দ তাঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন

উনিশ শতকেই। চিন্তারাজ্যে তাঁর এই মন্বন্তর ঘটানোর বীর্য্য তিনি তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের কাছ হতেই পেয়েছিলেন।

কিন্তু গভীর ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অনুধ্যান করলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। দুটি ধাবা তাঁর মধ্যে পাশাপাশি বইছে গঙ্গা-যমুনার মত। একদিকে অভাবনীয় ঔদার্য্য অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় প্রগতিশীলতা যেমন ছিল, অন্যদিকে তেমনি ছিল রক্ষণশীলতা বা অনড় স্থানুত্ব। ভারতের অতীত এবং বর্তমান আশ্চর্য্য কৌশলে ওতপ্রোত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে। তার প্রমাণ দিই এবার।

নিরাকারের তত্ত্ব জানলেও আজীবন তিনি মূর্ত্তিপূজক, সাকারে বিশ্বাসী সরলমনা ভক্ত। আল্লা কালী যিশু গড্ একজনেরই নাম যিনি বলতেন, সাধন করে এ-তত্ত্ব জানার জন্য 'প্যাঁজ দিয়ে রান্না ভাত খেয়ে' আল্লা মন্ত্র জপতে যাঁর আটকায় নি—তাঁর কিন্তু ধনী কামারণীর রান্না ডালে কামারে কামারে গন্ধ' লাগত। শঙ্কর ও বুদ্ধের চেয়ে শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বেশী। ধ্যান-জপ করতে যত ভাল লাগত, সংকীর্তনে উল্লাস তার চেয়ে একতিল কম নয় বরং হয়তো বেশীই। গুরুবাদ সম্বন্ধে তাঁর মতামত একেবারে গোঁড়া হিন্দুর মত। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখানো অন্যের সামনে গান গাওয়ানোতে—শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমোদন ছিল না। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে হিন্দুধর্মের নানা সংস্কার (যথা, অগস্ত্য যাত্রা করতে নাই, টিকটিকি পড়ল খাবারটা নিতে যেতেই, হাত সরিয়ে নিলাম'—'অমুকের মুখ দেখেছি না জানি কি হবে'—ইত্যাদি) মেনে, সেই সঙ্গে হিন্দুর সনাতন রীতিতে 'ফাটা পা বুড়ো বামুন' অকিঞ্চন অপ্রতিগ্রাহী সদাচারনিষ্ঠ হিন্দুর মতই জীবন কাটিয়ে গেছেন। বিবেকানন্দের মধ্যে কিন্তু সাবেকিআনা বা পুরাতন-রীতিনীতির চোদ্দ আনাই অনুপস্থিত। তিনি কায়মনোবাক্যে নব্য-ভারতের প্রতিভূ। অথচ এই কায়স্থ সন্তানটিকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ বা পুরাণ ঋষি দেখলেন। তাঁকেই নিজের সব দিয়ে ফকির

হলেন অবশেষে। যে-রামকৃষ্ণ বলতেন, 'কতকগুলি ইস্কুল হাসপাতাল করে কি হবে'? বলতেন 'তোমার সাধ্য কি তুমি লোকের হিত কর' এবং যাঁর মতে ভক্তি লাভ ও ভগবদ্দর্শন ছাড়া জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নাই--তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে বিবেকানন্দ জোর দিলেন জনসেবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ার দিকে। বললেন, আত্মমুক্তির জন্য সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারিদের কিছু করতে হবে না। নররূপী নারায়ণের সেবা করলেই জন্ম সার্থক। এ নিয়ে গুরু ভাইদের কাছে নরেন্দ্রনাথকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। নিজেও সংশয়ভরে বিশিষ্ট গুরুভাইদের যেমন ভক্তবীর গিরিশ ঘোষ বা সাধু নাগমশাইকে অনেক সময় প্রশ্ন করতেন "আমি কি ঠিক করছি?" আসলে অন্তরের দুর্বার প্রেরণায় তাঁর থামবার উপায় ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে চাপরাশ দিয়েছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দেবে'। সেইখানে ছিল স্বামীজির জোর। তাঁর ভাষায় তাঁর 'ঠাকুর অনন্ত ভাবময়'। তাঁর ইতি করবে কে? স্বামীজি বলতেন, আমার ভাবটাও আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তোমরা যা বুঝেছ তেমনি চল, আমি চলি আমার ধারণানুযায়ী। কিন্তু দুয়ের মূলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

তিনি ঠিক বলতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারত-ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ। এই ভারত-ধর্ম অর্থাৎ সনাতন ধর্মের বুকে কঠোর রক্ষণশীলতা আর করুণ-কোমল উদারতা, দুটি ধারাই পাশাপাশি বইছে আবহমান কাল। একদিকে রয়েছে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে নির্বিচারে তাঁকে মর্য্যাদা দেওয়া। আদিতে একজন ব্রহ্মবিৎ পুরুষ বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ বলে পূজা পেলেন। তারপর তাঁর পুত্র ও শিষ্য পরম্পরা অর্থাৎ যোনি এবং বিদ্যাবংশও তাঁর গোত্ররূপে চিহ্নিত হয়ে সমাজে জন্মসত্বে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসল। জাতি-ব্রাহ্মণকে এইভাবে মান দিয়ে বৈদিক সমাজ রক্ষণশীলতার চূড়ান্ত দেখিয়েছেন। পরাক্রান্ত রাজশক্তিও এই ব্রাহ্মণসমাজকে করমুক্ত ও দণ্ডবিধানের

আওতা হতে রেহাই দিতে বাধ্য হত। কিন্তু এই বৈদিক সমাজেই কান্যকুব্জাধিপতি গাধেয় (বিশ্বামিত্র) ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের উপর চরম অত্যাচার করেও তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করলেন, এ দৃষ্টান্তও আছে। ইতরার পুত্র মহীদাস (ঐতরেয় মহীদাস) জাবালার পুত্র সত্যকামের (জাবাল সত্যকাম) পিতৃ-পরিচয় নাই। তাঁরা দাসীপুত্র হয়েও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ রূপে ঋষি-সমাজে আচার্যের আসন অধিকার করেছেন। অভিজাত ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠির এই পরম উদার-বুদ্ধিই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অসাধারণ মহিমা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

ঋগ্বেদের সাতটি মণ্ডল সাতজন ঋষির নামে চিহ্নিত। তা হতে বোঝা যায় এই সপ্তর্ষি বৈদিক সমাজের চূড়ামণি। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র তারই দুইজন। রক্ষণশীলতা ও উদারতা যুগপৎ ক্রিয়া করছে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এ যদি বলি তো বলতে হয়, বৈদিক যুগের আদিতে ওই দুই প্রসিদ্ধ ঋষির পারস্পরিক বিগ্রহ ও সন্ধির আখ্যায়িকা তারই স্মারক। বিশ্বামিত্র ভারতবর্ষের বন্ধনবিমুক্ত বলিষ্ঠ ভাবনা ও তেজদৃপ্ত পৌরুষের প্রতীক। যে-শক্তিতে ভারতবর্ষ শক হুন গুর্জর কুষাণ পহ্লব যবন ইত্যাদি বহিরাগতদের আত্মসাৎ করে শৈব বৈষ্ণব বা শাক্ত সমাজে স্থান দিয়েছে, কালে সূর্য্যবংশীয় কি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে মান দিয়েছে--বিশ্বামিত্র তার সেই শক্তি। নামেই ঋষির স্বরূপ পরিস্ফুট। বিশ্বকে মিত্র করে তোলার যে অমিত বীর্য ও মনীষা—বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সেই দিকটি ফুটেছে। তাঁর বিরচিত গায়ত্রী আজও ভারতের দ্বিজাতিবৃন্দের ত্রিসন্ধ্যায় স্মর্তব্য। পুরাণের ভাষায় ক্ষত্রিয় হয়েও যারা ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী তাঁরা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। ঐতিহাসিক কালে বুদ্ধদেব ও আচার্য বিবেকানন্দের মধ্যে এই বিশ্বামিত্র ধারা-প্রত্যক্ষ করি। উভয়েই আচার্য-পদবাচ্য সুতরাং ব্রাহ্মণ বৈ কি! কিন্তু জাতিবিচারে বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়। গুণ-কর্ম বিচারে বিবেকানন্দও ক্ষত্রিয়।* তিনিও নিজেকে ক্ষত্রিয়ই

* শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ গীতা ১৮/৪৩
অথচ সেই সঙ্গে ব্রহ্মকর্মের লক্ষণও স্বামীজির মধ্যে ফুটেছিল।

বলতেন। দুজনেই মহাবিপ্লবী। সমাজের প্রচলিত বিধি বিধান উল্টে দিয়ে নব যুগের প্রবর্তন করাই তাঁদের জীবন-ব্রত ছিল এই ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ-ধারার সঙ্গে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-ধারার পার্থক্য কোথায় তা বশিষ্ঠকে অনুধ্যান করলে বোঝা যাবে।

ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের যে পরম্পরা তার আদিপুরুষ বশিষ্ঠদেব। ব্রাহ্মণ্য ভাবনার প্রাণপুরুষ বশিষ্ঠ শান্ত স্থৈর্য্যে ভারত-ধর্মকে ধারণ করে আছেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে সনাতন ধারার অনুগামী—তাঁর জীবনে বিপ্লবের গন্ধ নাই কোথাও। ব্রহ্মবিৎ বা মন্ত্রদ্রষ্টা হয়েও তিনি পুরাপুরি গৃহস্থ—পত্নী পুত্র ও পুত্র বধূ নিয়ে তাঁর বিস্তার সংসার। অধ্যয়ন অধ্যাপনা অতিথি-সৎকারে তাঁর নিরলস নিষ্ঠা, হোমধেনু নন্দিনী তাঁর অত্যাজ্য বৈভব। এক কথায় বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর জীবনে। সূর্য্য-বংশের পুরোহিত রূপে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগ। একদিকে তিনি বসিষ্ঠ [√বস্, আলো দেওয়া] অর্থাৎ জ্যোতিষ্মান: 'বাক্ বৈ বসিষ্ঠ, শ্রুতির এই নির্দ্দেশানুযায়ী তাঁকে জানি বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ও সারস্বত ধারার প্রবর্তকরূপে। এই ধারাতেই ভারতের পুরাণেতিহাস-প্রচারক মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আবির্ভাব সরস্বতীর বন্দনা করে সরস্বতী নদীর তীরে বসে যে-মহাকাব্য বসিষ্ঠের প্রপৌত্র রচনা করে গেছেন, তা বিশ্বজনীন মহাকাব্য। আবার অন্য বিচারে তিনি বশিষ্ঠ, অর্থাৎ 'বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি' তিনি সেই স্থিতপ্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভুবনেশ্বরী মন্ত্রের দ্রষ্টা ব্রাহ্মণোত্তম আত্মজ শক্তিকে বিনা দোষে যিনি রাক্ষস লেলিয়ে দিয়ে হত্যা করলেন সেই বিশ্বামিত্রকেও বশিষ্ঠ ক্ষমা করেছিলেন। ব্যাসদেব বলছেন, 'প্রতিকারের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বামিত্র বা তাঁর বংশ—কারও হানি করতে বশিষ্ঠ চাননি।' এই শমগুণ এই ক্ষান্তি ভারতীয় ব্রাহ্মণের পরম ঐশ্বর্য। সেই সঙ্গে রয়েছে মহা প্রেমের বীজ—বিশ্বামিত্র তপস্যা করেও মান পেতেন না, যদি বশিষ্ঠ তাঁর এই মহাশত্রুটিকে

ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিয়ে কোল না দিতেন। বশিষ্ঠ তা করেছিলেন। করেছিলেন বলেই তাঁর বংশে পর পর চারজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উদ্ভব হল—শক্তি, পরাশর ব্যাস ও শুকদেব। বশিষ্ঠ সহ এই পাঁচ ঋষি ভারতবর্ষের প্রাণ পুরুষ বললেও চলে। বেদ-পূরাণ তন্ত্র-মন্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে কোন-না-কোন রকমে এই পাঁচ জনেরই উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করি। আর ভগবান ব্যাসদেব? আজও তিনি সন্ন্যাসীদের সার্বভৌম গুরু গুরু পূর্ণিমায় ব্যাসপূজা বৈদিক-অবৈদিক প্রত্যেক সন্ন্যাসীই করে থাকেন। ব্যাস শুক গৌড়পাদ গোবিন্দপাদ হতে আচার্য শঙ্কর - বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ভাবনা আজও এই ধারায় প্রবহমান। সুতরাং বশিষ্ঠদেবকে যদি সনাতন ধর্মের মৌল প্রতীক বলে ধরি তো ভুল হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দুটি ধারাই এসে মিলেছিল আগেই বলেছি। কারণ ভারতবর্ষে দুই ধারাই প্রথম হতে পাশাপাশি বইছে। কিন্তু পরে আমরা দেখি বিবেকানন্দে বিশ্বামিত্র-ধারার প্রাধান্য আর শ্রীনিগমানন্দ ছিলেন ওই বশিষ্ঠ-ধারার বাহক। তাঁর সমগ্র জীবন রক্ষণশীল সনাতন হিন্দুধারায় পরিণামিত হয়েছে। রক্ষণশীলতাকে যাঁরা গোড়ামি ভাবেন তাঁরা কিন্তু ভুল করেন। আচার্য বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণেতর ভক্তদের উপবীত গ্রহণ অনুমোদন করতেন অথচ পূজা-পার্বণে রীতিমত ব্রাহ্মণ ডেকে পূজার্চনা করতেন। রক্ষণশীলতার প্রকৃত অর্থ হল স্বধর্মে নিষ্ঠা। যিনি যত পরিমাণে নৈষ্ঠিক তিনি ততটাই রক্ষণশীল। এবং এই বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ নৈষ্ঠিক হিন্দু ব্রাহ্মণ। উদারতার অভাব না থাকলেও চিরাচরিত অধ্যাত্মরীতিতে তাঁর আস্থা ছিল সুগভীর। শ্রীনিগমানন্দের এই দিকটাকেই বলছি রক্ষণশীল সনাতন হিন্দু-ধারা। আচার্য বশিষ্ঠদেব হতে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত আর্য ভাবনার যে একটি সংহত বিকাশ শ্রীনিগমানন্দ তাকে ঋষি-ধারা বলতেন। নিজের কর্মজীবনে এই সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মকে রূপ দেওয়াই তাঁর জগদ্ধিত ব্রত। তিনি

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিভূ বলেই তাঁকে রক্ষণশীল বলছি। উনিশ শতকের শেষভাগে জন্মেও ধ্যান-ধারনায় আদর্শে ও ধর্মে-শ্রীনিগমানন্দ প্রাচীনপন্থী। অস্পৃশ্যতা বর্জন, নারী-জাগরণ, তথাকথিত স্কুল কলেজের শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, স্বদেশী, সশস্ত্র বিপ্লব বা গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন এ যুগের এই সব জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। এর কোনটিরই কোন সুদূর প্রসারী সুফল আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তা বলে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সবই সদ্‌গুণ এমন তিনি বলেন নি। আসলে জাতীয় জীবনে যে সব গুরুতর ত্রুটি ও সংকট প্রকাশ পাচ্ছে ঋষি প্রদর্শিত পথেই তার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব এই-ই ছিল তাঁর মত। চতুরাশ্রম এবং চাতুর্বর্ণ্যের যথোচিত মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটবে এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল বলেই নিজে যে-সব মঠাশ্রম পত্তন করেছিলেন সেখানে তদনুকূল বিধি-বিধানই তিনি নির্দ্দিষ্ট রেখেছিলেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হলেই সব হাঙ্গামার জের মিটে যেত। এ-মনুষ্যত্ব কিন্তু পশ্চিমের 'humanity' নয়—মনু সংহিতার মানব ধর্ম। ভারতীয় সংস্কৃতির উষালগ্নে প্রজাপতি মানব-জীবনকে ব্রাহ্ম জীবনে (ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ) উন্নীত করার যে-মহান পরিকল্পনা দিয়ে গেছেন, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের বন্ধনীতে সুসংবদ্ধ পঞ্চমহাযজ্ঞ-প্রধান গৃহস্থ জীবন যাপন করাই এই মানব-ধর্মের সার কথা। শ্রীনিগমানন্দের আদর্শের সহায়তা কল্পে যাঁরা তাঁর কাছ থেকে ত্যাগধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন সেই সন্ন্যাসী-দেরও তিনি সমাজে ওই প্রাচীন আদর্শ প্রচারের কর্মেই ব্রতী করে গেছেন। গুরুর সঙ্কল্পিত কর্মে আত্মাহুতি দান করাই শ্রীনিগমানন্দের অনুবর্ত্তী সন্ন্যাসীবৃন্দের আত্মোন্নতির একমাত্র সাধনা। আর নিজ নিজ পরিবারে শ্রীগুরু-প্রচারিত আদর্শ গৃহস্থ জীবনকে সাধ্যমত রূপ দেওয়াই তাঁর গৃহী শিষ্যদের একমাত্র ভজন-পূজন। এর মধ্যে অভিনবত্ব বা আধুনিকতার কিছু নাই। শান্তরসাস্পদ তপোবনে বসে

হাজার হাজার বছর আগে বৈদিক ঋষি-সমাজ ভারতকে যে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন—এ কেবল বর্তমান সমাজের কানে সেই পুরাতন মন্ত্রেরই নব গুঞ্জরণ। আমরা একেই বশিষ্ঠ-ধারা বলছি।

বিশ শতকের পারমাণবিক আবিষ্কার ও জড়বিজ্ঞানের যন্ত্রসমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যের মাঝখানে বসে কেবল মনুষ্যত্ব মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ-সংশ্রয়ের কথা, কেবলই মনু-সংহিতার সমাজবিজ্ঞান আর গীতার জীবনদর্শন নিয়ে আলাপ কেমন খাপছাড়া লাগে না? সে-তুলনায় স্বামী বিবেকানন্দকে আমাদের অনেক বেশী যুগোপযোগী বলে মনে হয়। বেদ-উপনিষদ গীতার আদর্শ তিনিই কি প্রচার করেন নি? সেই সঙ্গে আধুনিক সব সমস্যারই বিচারসম্মত সমাধান করতে চেয়েছেন—অভিনন্দিত করেছেন দেশের কুসংস্কার মুক্ত নব্য যুবকদের। বিবেকানন্দ তাদেরই একজন। তিনি পরাধীনতার নাগপাশ-মোচন ও ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ বর্তমান ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন এবং অনুগামীদের শতমুখে সেই বার্তা শুনিয়েছেন। অবতার-পুরুষদের মধ্যে এজন্য বুদ্ধ ও শঙ্কর—যুক্তিনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমানশিরোমণি দুই জ্ঞানাবতার তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

এই বিচারে শ্রীনিগমানন্দ সেকেলে বৈ কি! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ? ওই স্বামীজির যিনি আরাধ্য ঈশ্বর? তাঁর কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত সমাধি মগ্ন মহাযোগী মূর্তিতে ভারতাত্মার যে সনাতন ঐশ্বর্য বিধৃত আছে, পরমহংস নিগমানন্দের জীবনে সেই বৈভবেরই ভাস্বর প্রকাশ। তাই নিগমানন্দ বর্তমান ভারতের উদ্‌গাতা নন, সনাতন ভারতের দিশারী। চির পুরাতন হলেও যা সর্ব দেশে সর্ব কালে সত্য—সেই চির নূতন সত্যকেই সনাতন ধর্ম বলে। বশিষ্ঠ তার অন্যতম ধারক এবং শ্রীনিগমানন্দও তাই।

একটি ধ্রুব বিন্দুকে কেন্দ্র করে যেমন এই সৌরজগতের অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্রাদি বিপুল বেগে দিক-দিগন্তরে ছুটে চলেও কক্ষচ্যুত

হয় না—তেমনি অনন্ততন অনাদি-নিধন যে সনাতন সত্যের আশ্রয়ে ভারতবর্ষ যুগ-যুগান্তর ধরে অগণিত মত ও পথের প্রবর্তক মহাশক্তিধর পুরুষদের এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে, বশিষ্ঠ-ধারার মুখ্যপ্রাণ সেই সনাতনত্ব। ঠাকুর নিগমানন্দের জীবনেও সনাতনত্বের দ্যোতনাই মুখ্য।

কিন্তু আবার বলি, রক্ষণশীলতার অর্থ গোঁড়ামী নয় এবং সনাতনত্ব বললে সাম্প্রদায়িকতাদোষপুষ্ট অনুদারতা বোঝায় না। বশিষ্ঠদেব সনাতন ধর্মের প্রতিভূ বলেই জাতি-ব্রাহ্মণ না হলেও তপস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন গোত্রহীন জাবাল সত্যকামকে আচার্যপদ যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরাও সনাতন ধর্মের রক্ষক। জাতি-ব্রাহ্মণকে যেমন মান দিতেন তেমনি এ-কথা তাঁরা ভুলতেন না যে মূলে গুণকর্মবিভাগই চতুর্বর্ণের উদ্ভব-স্থল।

শ্রীনিগমানন্দদেবের মধ্যেও সনাতনত্বের এই বৈশিষ্ট পূর্ণমাত্রায় প্রকট। তিনি ঋষি যুগের উদার বুদ্ধির অধিকারী—তাঁর শাস্ত্র-সমন্বয়করী চারখানি বইয়েই এর প্রমাণ আছে।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥

যোগবাশিষ্ঠের এই অপূর্ব উক্তি তাঁর মূলমন্ত্র। তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁর গ্রন্থগুলিতে কুল-গুরু প্রথা, অনাচাবী ব্রাহ্মণের জাতিদম্ভ, বিচারহীন আচারে অভ্যস্ত গোঁড়া হিন্দু এবং সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর ভেকধারী ভণ্ডতপস্বী সম্প্রদায়—শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ ও জ্ঞান-ভক্তিতে ভেদ-দর্শন ইত্যাদি প্রচলিত হিন্দুধর্মের উৎকট গ্লানিগুলির কঠোর সমালোচনা করেছেন।

কেবল কথায় নয় কাজেও শ্রীনিগমানন্দ সনাতন ঋষি-ধারার অনুগামী। যাকে তিনি সারস্বত মঠের প্রথম মোহান্ত নির্বাচন করে বৈদিক উপনয়ন ও বৈদিক সন্ন্যাস দান করেন তিনি জাতি-ব্রাহ্মণ নন। অথচ গুণকর্ম বিচারে শ্রীমৎ নির্বাণানন্দ সরস্বতী

(অনির্বাণ) যে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ সে কথা আজ বিশ্বের সকলেই জানেন। যাঁদের তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জন্ম-সূত্রে অব্রাহ্মণ। এমনও দু'চারজন অন্তেবাসী ব্রহ্মচারী ছিলেন গোঁড়া হিন্দুর কাছে যাঁরা পঞ্চমবর্ণ। এতেই বোঝা যায় জাতিগত বর্ণবিচারের চেয়ে পরমহংস নিগমানন্দের কাছে গুণকর্ম-বিচারই মুখ্য। মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার বেলাতেও তিনি এই নীতি অনুসরণ করতেন বলে তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীতে ছত্রিশ জাতির স্থান ছিল। সমাজে জাতিধর্ম মেনে চললেও উৎসবাদিতে বা ভক্তসম্মিলনীতে, মঠে আশ্রমে তাঁর শিষ্য ভক্তরা প্রসাদগ্রহণের বেলায় পরস্পরকে গুরু ভাই ভাবা ছাড়া অন্য কোন বিচার আনবে না—এই ছিল তাঁর অনুশাসন। তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যরা অবশ্যই গৃহী শিষ্যদের প্রণম্য—সে ক্ষেত্রেও জাতি বিচার যেন না ওঠে—এও তাঁর নির্দেশ।

নিজের জীবনে তিনি "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" এই আর্ষ নির্দেশকে রূপ দিয়ে গেছেন। শিখা-সূত্র ত্যাগ করে ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার তিনি রাখেন নি। দৃষ্টান্ত, হাওড়ায় তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্য থাকলেও ভক্তোত্তম বিচারে যে শিষ্যের গৃহে তিনি অন্ন গ্রহণ করতেন তিনি ব্রাহ্মণ নন। এই ধরণের স্বাতন্ত্র্য তিনি আহারে বিহারে সর্বদা রক্ষা করতেন। এগুলি যে সত্যই সনাতন ধর্মের অবিরোধী তা যাঁরা মানেন না তাঁরা উপনিষদের ছোট ছোট কাহিনী বা পুরাণ আখ্যায়িকা পড়েন নি। ওই সব কাহিনী ও আখ্যায়িকার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে ঋষিযুগে আচার্য ও কুলপতি-পদবাচ্য বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেরা বর্ণাশ্রমের গণ্ডী ছাড়িয়ে কি ভাবে বিচারে সিদ্ধ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে মুক্তমনা অত্যাশ্রমীর পরিচয় দিতেন। পরমহংস নিগমানন্দ তাঁদেরই উত্তরসূরী।

দশনামা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হয়েও তিনি তাই অকুতোভয়ে বলে ছিলেন "শঙ্করাচার্যের মত উদার, কিন্তু পথ সঙ্কীর্ণ—যেমন ব্রাহ্মণ ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার কারো নাই ইত্যাদি। চৈতন্যদেবের পথ উদার,

কিন্তু মত সংকীর্ণ" (নিগমপ্রসাদ পৃঃ ৬৮)। অন্যত্র বলেছেন "আমি এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া সারস্বত মঠের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ইহাই আমার প্রচারিত শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ। আমি এইভাবেই তোমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিব ও পরিচালিত করিব" (সারস্বত মঠ ও স্বামী স্বরূপানন্দ, পৃ.৯৭)।

লক্ষণীয় এই জন্য জ্ঞানীগুরুতে বিবিধ প্রবন্ধে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলেও তিনি নিজ প্রচারিত ধর্মকে বলেছেন 'সনাতন ধর্ম' এবং নিজে 'অসাম্প্রদায়িক ভাবে' ধর্ম প্রচার করেছেন। সুতরাং সব রকমেই ঠাকুর নিগমানন্দের জীবনে সনাতনত্বের দ্যোতনাই মুখ্য।

এ ছাড়া আরেক দিক দিয়েও বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে ঠাকুর নিগমানন্দের গভীর সংযোগ আছে।

আমরা জানি শ্রীনিগমানন্দদেব বীরভূম জেলার তারাপুর গ্রামস্থিত তারাপীঠে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ হন। তারাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বশিষ্ঠারাধিতা তারা বলেই প্রসিদ্ধ। বশিষ্ঠদেব বীরভাবে সাধনায় এখানে সিদ্ধিলাভ করেন বলেই এটি সিদ্ধপীঠ। এ যুগে মহাকৌল বামাক্ষেপা এই সিদ্ধপীঠে তারামন্ত্রে সিদ্ধ হন। তাঁকে উত্তর সাধকরূপে বরণ করে ঠাকুর নিগমানন্দও তারা মন্ত্রে ইষ্টসিদ্ধি লাভ করেন।

তারার্ণবে বশিষ্ঠদেবের সাধনক্রম বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে, তিনি বহু আরাধনাতেও দশমহাবিদ্যার অন্যতমা তারাদেবীর প্রসন্নতা লাভ করতে না পারায় তাঁকে সুদারুণ শাপ দেন। শাপগ্রস্তা বিদ্যা তদবধি নিষ্ফলা ছিল। পরে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবই তারা দেবীর মূলমন্ত্র 'ত্রীং' বীজকে 'স্ত্রীং' বীজে পরিবর্ত্তিত করেন। তদবধি এটি তন্ত্রে বধূবীজ বলে খ্যাত হল এবং দেবী চরাচরে বধূর মত যশস্বিনী হলেন। সর্ব বিদ্যায় সিদ্ধিদাত্রী জয়াভিলাষীর জয়দাত্রী এই 'স্ত্রীং' বীজ বিষহারিণী অমৃতস্বরূপা।

তারার্ণবের এই আখ্যানে রহস্য-ভাষায় এক গূঢ় তত্ত্ব পরিবেশন করা হয়েছে। আগমবাগীশদের বিভিন্ন উক্তি হতে তার মর্ম বুঝতে

হয়। তন্ত্রাচার্যরা বলেন দেবীকে মাতৃভাবে আরাধনা করলে তিনি সহজেই প্রসন্না হন। কিন্তু বীরসাধক পত্নীভাবে তাঁকে লাভ করতে চাইলে মহাশক্তি ঐ সাধককে কঠিন পরীক্ষা করেন। স্বয়ং জগদগুরু সদাশিবই পরমেশ্বরীর একমাত্র ভর্তা। সুতরাং সাধনায় শিবত্ব অর্থাৎ গুরুভাব লাভ না করা পর্যন্ত দেবী ও সাধকের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ ঘটে। বৈদিক ঋষি-ধারার আদি পুরুষ বশিষ্ঠও এজন্য কোনমতেই দেবীকে প্রসন্ন করতে পারেননি। কিন্তু মূলে তিনি গুরুভাবের আধার তাই সাধনশৌর্যে দেবীকে অভিসম্পাত দেওয়ার মত বীর্য তাঁর ছিল। অভিশপ্তা হয়েও দেবী তাঁকে ভজনা করেন নি। পরে জ্ঞানযোগে আত্মস্বরূপ অবগত হয়ে বশিষ্ঠ যখন নিজেকে 'গুরু' বলে জানলেন তখন তিনি অনায়াসে বধূবীজের দ্রষ্টা বা ঋষি-রূপে পরিগণিত হলেন। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষই জগদগুরু আর তারাদেবী পরব্রহ্ম-মহিষী (শঙ্করাচার্য আনন্দলহরী)। তিনি গুরু-ব্রহ্মের পরমা প্রকৃতি বা গুরুশক্তি। গুরুতত্ত্বে অধিষ্ঠিত না হলে মহাবিদ্যা তারাদেবীকে পত্নীরূপে অধিকার করা যায় না—তারার্ণবের রহস্যোক্তিতে এই সত্য প্রকাশ করা হয়েছে। মহেশ্বরীকে বীরভাবে ভজনা করার এই ই হল সনাতন ধারা।

বধূবীজের দ্রষ্টা ঋষি বশিষ্ঠদেবের জীবনে যা ঘটেছিল, শিবত্বের সাধক প্রত্যেক কৌলের জীবনে তা ঘটে। অবশ্যই শিবসাযুজ্যস্পর্ধী সিদ্ধ কৌলের সংখ্যা এ-জগতে কোন যুগেই দু'একটির বেশী নয়। কিন্তু শিবত্ব লাভ করতে হলে মহাশক্তির প্রচণ্ড বিরোধিতা ও অকরুণা সহ্য করেও স্বীয় বীর্যে তাঁকে বশীভূত করার সংকল্প এই সব শিবতুল্য যোগী কখনও ত্যাগ করেন না। তার ফলে, তাঁদের জীবনে দেবীর প্রতিকূলতায় ভীষণ সংকট দেখা দেয়। আর সেই সংকট পার হতে গিয়ে সাধক অতি দ্রুত পর বৈরাগ্য ও মহাজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। পর-বৈরাগ্য ও মহাজ্ঞান লাভ অর্থ ই শিবত্ব লাভ। তখন দেবী স্বয়ং প্রসাদসুমুখী হয়ে ওই সিদ্ধ পুরুষকে ভজনা করেন, নিজেই

পত্নীরূপে ধরা দেন। শিবস্বরূপ কৌল তত্ত্বত তাঁকে আত্মশক্তি বা স্বীয়া প্রকৃতি বলে জেনে, স্ত্রীরূপে স্বীকার করেন। তাঁর এই স্বীকৃতিই তন্ত্রের ভাষায় তারাদেবীর শাপোদ্ধার।

এ যুগে সদ্‌গুরু নিগমানন্দের জীবনে ঠিক এই ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখি। আমরা জানি প্রায় সাড়ে তিনশ' বৎসর আগে শ্রীনিগমানন্দ মহাকৌল ব্রহ্মানন্দ গিরি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর যোগীগুরু সুমেরদাসজী তাঁকে এ-বিষয়ে অবহিত করে যোগবলে শ্রীনিগমানন্দের পূর্ব জীবন ছায়াচিত্রের মত আনুপূর্বিক দেখিয়েছিলেন। পরে শ্রীনিগমানন্দদেব তাঁর প্রাচীন সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের কাছে এই রহস্য প্রকাশ করেন (স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী যোগানন্দ এবং যোগেশ্বর গাঙ্গুলী ও নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়ের দিনলিপির সৌজন্যে জ্ঞাত)।

গিরি মহারাজ প্রণয়িনীভাবে পরমেশ্বরীর আরাধনা করতেন। তিনি মহাশক্তিশালী কৌল সাধক হলেও দেবী প্রথমাবধি নানাভাবে তাঁর সাধন বিঘ্ন ঘটাতে থাকেন। সেই সব উৎপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করেও ব্রহ্মানন্দ যখন তাঁর সঙ্কল্প হতে চ্যুত হলেন না, তখন তাঁর সাধন-শৌর্যে পরাস্ত হয়ে দেবী তাঁকে দর্শন দান করলেন। কিন্তু অভিলষিত প্রার্থনা পূরণ না করে বললেন 'আগামী জন্মে তুমি আমায় লাভ করবে। এখনও তুমি শিবত্ব প্রাপ্ত হও নাই। সুতরাং পত্নীভাবে আমাকে পেতে পার না।' ক্রুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ অন্য সব বর নিতে অস্বীকার করায় তিনি অবশেষে 'আমাকে প্রাপ্ত হলেও চিনতে পারবে না' এই বর দেন। পরে 'অন্য কিছু চাও' বলায় রুষ্ট গিরি মহারাজ মন্ত্রবশীভূতা মহাশক্তিকে আদেশ করলেন 'তুমি আমার দাসী। সুতরাং আমার এই প্রস্তরাসন (প্রায় বার মন ওজন হবে) বহন করে আমার পিছনে ঘুরতে থাক। যতক্ষণ আমি নিষেধ না করব তোমায় এইভাবে থাকতে হবে।' প্রায় দশ বার বৎসর দেবীকে ওই নির্দেশানুযায়ী প্রস্তর বহন করে ব্রহ্মানন্দের অনুসরণ করতে হয়। অমোঘ তপঃবীর্যে মহামহেশ্বরীকে

তিনি শাপগ্রস্তা করেই রেখেছিলেন। ঢাকা শহরের রমণা কালীবাড়ীতে গিরি মহারাজের গুরুদেব বাস করছেন জেনে ব্রহ্মানন্দ যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ অভিলাষী হলেন, তখন দেবী সেই প্রস্তর ভার হতে মুক্তি পান। ওই পাথরখানা তদবধি রমণা কালীবাড়ীতে ছিল। স্থানীয় লোকে ওটিকে ব্রহ্মানন্দের সাধন-পীঠ বলে জানত। শ্রীনিগমানন্দদেব তাঁর প্রাচীন সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের স্বয়ং ওই রমণা কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে পাথরখানি দেখিয়ে ব্রহ্মানন্দ গিরির অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁর সঙ্গে শ্রীনিগমানন্দ দেবের জন্মান্তরীণ যোগসূত্রের কথা প্রকাশ করেছেন।

গিরি মহারাজ প্রৌঢ় বয়সে একরূপবতী পাটনীকন্যাকে দেখে বিমোহিত হয়ে তাঁকে নিয়ে সংসারী হন। পরে দুটি সন্তান হওয়ার পর একদা কোন কারণে রুষ্ট হয়ে সেই পাটনীকন্যাকে চপেটাঘাত করায় তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করলেন। তখন দৈববাণীতে গিরি মহারাজ জানলেন ইনি শাপভ্রষ্টা মহাদেবী স্বয়ং। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে মর্মাহত ব্রহ্মানন্দ শোকে দুঃখে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন শোকাচ্ছন্ন থাকার পর নিজ শিষ্য পূর্ণানন্দের চেষ্টায় প্রকৃতিস্থ হয়ে অবশিষ্ট জীবন পর-বৈরাগ্য ও জ্ঞান যোগের অনুশীলন করেন। নিজ জীবনের বিপর্যয়ে তিনি প্রত্যক্ষ জানলেন যে আত্মস্বরূপ অবগত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত সাধন-ভজনই এক রকম নিরর্থক। মহাশক্তিকে পদানত করলেও সুখ-শান্তি মেলে না। 'নাত্মলাভাৎ পরো লাভো' —নিজেকে পাওয়া বা ব্রহ্মাত্মভাব লাভই পরম লাভ। এই সুদৃঢ় জ্ঞান-বৈরাগ্য সংস্কার নিয়েই গিরি মহারাজের দেহান্ত হয়।

পাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকান উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

শ্রীনিগমানন্দদেব এই গীতা-বাক্যের মূর্ত উদাহরণ। তিনি জন্ম-সত্ত্বে উদাসীন ও সহজ জ্ঞানে আরূঢ় ছিলেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের বৃত্তান্ত আলোচনা করলেই নলিনীকান্তের এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমাদের

চোখে পড়ে। তার অর্থ, পূর্ব জন্মেই তিনি শিবসত্তা বা গুরুভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। আজীবন মহাশক্তির ভয়াবহ প্রতিকূলতা সহ্য করায় স্বভাবতঃ ব্রহ্মানন্দ গিরির চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হয়েছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব জ্ঞানের সাতটি ভূমি বা সোপান আছে বলেছেন। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ মহাকৌল ব্রহ্মানন্দজী শেষ জীবনে তনুমনসা বা জ্ঞানের তৃতীয় ভূমিতে আরোহন করে চতুর্থ ভূমি লাভের জন্য অবশ্যই সচেষ্ট ছিলেন। সেই সাধন ফল পূর্ণ মাত্রায় শ্রীনলিনীকান্তে বিরাজিত ছিল। সুতরাং তিনি এবার জন্মকাল হইতেই শিবত্বের সাধক। আর সেইজন্য সাধ্বী স্ত্রী যেমন প্রতিপদে স্বামীর প্রত্যেক কাজে সহায়তা করে তাঁর অধ্যাত্মপথ সুগম করে সহধর্মিণী সংজ্ঞা সার্থক করেন—তেমনি ব্রহ্মানন্দের সাধন লব্ধ সিদ্ধ বিদ্যা এবার প্রতি পদে অনুকূলা হয়ে ঠাকুর নিগমানন্দকে হাতে ধরে সাধনরাজ্যের পরম পর্বে উন্নীত করেছেন। এই জন্য মাত্র তিন বৎসরে শ্রীনিগমানন্দদেব ভারতের হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত জ্ঞান রাশি অনায়াসে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর তন্ত্র সাধনার পর্বটিকে তিনি 'মায়ের কৃপা' নামে চিহ্নিত করেছেন। শাস্ত্র প্রমাণে জানা যায় 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' মহামহেশ্বরী অনুকূলা হয়ে দ্বার ছেড়ে না দিলে ('মোক্ষদ্বার কপাট-পাটনকারী'—শঙ্করাচার্য) কি নির্বাণমুক্তি বা নির্বিকল্পের জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারেন?

ব্রহ্মানন্দের দ্বারা শাপগ্রস্তা হয়েও তারিণীদেবী এই ভাবে পরজন্মে তাঁর আনুকূল্য করায় নির্বিকল্প-ব্যুত্থিত সদ্‌গুরু নিগমানন্দ অবশেষে দেবীকে তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী বা বধূরূপে স্বীকার করলেন। শ্রীনিগমানন্দদেব তারাদেবীকে এইভাবে মর্যাদা না দিলে সাধক সমাজে কিন্তু মহাবিদ্যা তারার চির অখ্যাতি থাকত। ওইটি হল পুরাণবর্ণিত জ্ঞান-গরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কর্তৃক তারাদেবীর শাপোদ্ধার পর্বের পুনরাবৃত্তি।

সুতরাং গুরু বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে ঠাকুর নিগমানন্দের এই দিক হতে নিবিড় ঐক্য রয়েছে। এই নিগূঢ় ঐক্যের বশেই ভারতে অগণিত সিদ্ধপীঠ ও শক্তিপীঠ থাকলেও শ্রীনিগমানন্দদেব তন্ত্রসাধনকালে বশিষ্ঠারাধিতা তারাপীঠে আকর্ষিত হয়েছিলেন।

সুতরাং ভাবনা ও সাধনা উভয়ক্ষেত্রেই 'জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ' বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে সদ্‌গুরু শ্রীনিগমানন্দের সৌসাদৃশ্য বর্তমান।

———

সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীনিগমানন্দ প্রসঙ্গ

জয়গুরু মহামন্ত্রের উপাসক সারস্বত সঙ্ঘ যে গুরুবাদী তাতে কোনও সন্দেহ নাই। গুরু সেই সচ্চিদানন্দ। গুরু "এক বই দুই নাই" বলে শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুবাদের মূল সূত্রটি সর্বসাধারণকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। শাস্ত্র ও আপ্তবাক্য এক হয়ে মিলে আছে কথামৃতে। আবার অন্যত্র অবতার ও গুরুর পার্থক্য ধরিয়ে দিতে চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'গুরু, কর্ত্তা, বাবা এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা দেয়'। তাঁর বলার ধরণে কি মনে হয় না, তিনটির সংজ্ঞা যেন অনেকটা একই ভাবের অনুবৃত্তি এই-ই তিনি ইঙ্গিত করেছেন? গীতায় জগদ্‌গুরুকে ঠিক ঐ তিন ভূমিতেই আরূঢ় দেখি—তিনি কর্ত্তা ও পিতা। আর গুরু তো বটেই। সদ্‌গুরু নিগমানন্দকে আমরা এই গুরুতত্ত্বের 'মানুষী তনু' রূপে গ্রহণ করতেই আদিষ্ট হয়েছি। 'নরাকার পরব্রহ্মে'র 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ঘোষণা বেদান্তের প্রাণসার। ঠাকুর নিগমানন্দ অপরোক্ষানুভবে নিত্য সেই শ্রুতি-সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কিন্তু যেমন বেদ বিভিন্ন, শ্রুতি বিভিন্ন এবং 'নানা মুনির নানা মত' তেমনি গুরুবাদীদের মধ্যেও সূক্ষ্ম ভেদ আছে। তাতে ক্ষোভের কিছু আছে তো মনে হয় না। ব্রহ্মের বৈচিত্র্যে এ জগৎ। জগদ্‌বাসীর ভাববৈচিত্র্য থাকবেই।

গুরুবাদীদের এক পক্ষের সিদ্ধান্ত 'যদ্যপ আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥' এ অনুভব যার পাকা হয়ে গেছে তিনি সবার প্রণম্য। 'গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা না মিলে এক,' সন্তবাণীতে ঐ যে দুর্ল্লভজনের ইশারা, উপরোক্ত সাধক সেই 'চেলা'। ইনি 'গুরুদত্ত মন্ত্র জপছি' এই অমোঘ বিশ্বাসের বজ্রবলে বলী হয়ে 'টোপাল' নাম জপে গোপালের দেখা পান। এঁকে হেলাভরে—মন্ত্র দিয়ে গুরুতা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ

দশভূজাদি নানা দেবদেবী মূর্ত্তি দর্শন করে 'চেলা'র ভক্তি বিশ্বাসে নিজেও ধন্য হয়ে যান। বস্তুতঃ এই রকম চেলা বা শিষ্যই গুরুতত্ত্বের মহিমা যথার্থতঃ অবগত আছেন।

ব্রহ্ম তো সত্যই জগদ্‌ব্যাপ্ত। ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সুতরাং 'যেমন ভাব তেমন লাভ'। গুরু বুদ্ধিতে দৃঢ় নিষ্ঠায় যাঁকে ধরবে তার মধ্য দিয়েই যে সেই পরমগুরুর কৃপা বর্ষিত হতে পারে। তিনি কেমন, তিনি কি, এ বিচার সে ক্ষেত্রে একেবারেই মূঢ়তা। শুধু মূঢ়তা কেন, তাতে প্রত্যবায়ও ঘটে। ঠাকুর নিগমানন্দ গল্প করতেন, 'আমার গুরু যে ডোম', এ কথা বলায় নারায়ণ নারদকে নরক বাসের ব্যবস্থা দেন। শেষে গুরু কৃপাতেই নারদ রক্ষা পেয়ে গেলেন (শ্রীনিঃ কথামৃত)। একজনের মুখে তাঁর কুলগুরুর মহাদোষের সমালোচনা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠেছিলেন 'তাতে তোমার কি ? তুমি তাঁকে সচ্চিদানন্দ মনে করবে'। কাজেই গুরুর বিচার না করে 'আমার গুরু সেই তিনিই' এ দৃষ্টিতে যিনি গুরুকে দেখেন গুরুবাদের যথার্থ ধারক বা উত্তমাধিকারী কিন্তু তিনিই। তাকে দশ দুয়ারে ঘুরতে হয় না, সংশয়ের জ্বালায় জ্বলতে হয় না,—আর ঠকতেও হয় না! ভক্তি বিশ্বাস থাকলে ঘরের থামটা ভেদ করেও জগদ্‌গুরু তাঁর ভক্তকে 'নরহরি' রূপে দর্শন দেন।

কিন্তু এ ছাড়া আরেক থাকের গুরুবাদীও আছেন। তাঁরা উত্তমাধিকারী নিশ্চয় নন্‌—কিন্তু অধমও বলা চলবে না। হয়তো এঁরা নচিকেতার মত মধ্যমাধিকারী (কঠ—১।১।৫) অর্থাৎ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু। তাঁদের পথ কিন্তু কঠিন ও দুর্গম। তাঁরা চান গুরু যাচাই করে নিতে, চান তাঁদের গুরু হবেন ব্রহ্মবিদ-বরিষ্ঠ, সাক্ষাৎ নরশঙ্কর। বিজয় গোঁসাই এর মত তত্ত্বদর্শীরা তাঁদের প্ররোচিত করেন এ আকাঙ্ক্ষা লালনে—

সদগুরু সর্বদা পৃথিবীতে আগমন করেন না। আর এক সময় একজনের অধিক সদগুরু অবতীর্ণ হন না। সদগুরুর মর্ত্যধামে

আগমনের নিয়ম ভগবানের মানুষী-তনু গ্রহণের যে নিয়ম তদনুরূপ। অর্থাৎ এক সময় পৃথিবীতে ভগবানের বা সদ্‌গুরুর এক ভিন্ন অনেক আবির্ভাব হয় না। সিদ্ধ বা মহাপুরুষগণ জীবকোটী ভগবানের আবেশ (শক্ত্যাবেশ)। তাঁদের দেহ-দেহী ভিন্ন। সদ্‌গুরু ব্রহ্মকোটী তাঁর দেহ ও দেহী অভিন্ন। (জীবন চরিত—জগবন্ধু মৈত্রী)

পড়লে ভারী লোভ হয় না! মনে হয় না আমার ঠিক এই রকম গুরুই চাই? কিন্তু সমস্যা হ'ল তাঁকে চিনব কেমন করে? জগদ্‌গুরু গীতা মুখে বললেন 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ'। সন্তরা বলছেন 'তার যত ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বোঝায়'। হরি! হরি! বিজ্ঞরাই যদি না বোঝেন সাধারণ জীব কেমন করে ধরবে কে 'সদ্‌গুরু'? বোঝা যে কত কঠিন হয়, তার একটা উদাহরণ দিই। বর্ত্তমান যুগের বিশ্ববিখ্যাত কোন মহাযোগী বলছেন 'পূর্ণযোগের যিনি গুরু তিনি অন্তর্যামী গুরুর প্রতিভূ। সুতরাং অন্তর্যামীর যে রীতি তাঁরও সেই রীতি। শিষ্যকে তিনি পরিচালনা করেন তার স্বভাব অনুযায়ী, গুরুভার হয়ে তার উপর চেপে বসেন না—(যোগ-সমন্বয় প্রসঙ্গ)। অথচ শ্রীচৈতন্য বলছেন, 'সেই প্রভু ধন্য যেবা চুলে ধরি আনে।' আর তারই পোষকতা করে শ্রীরামকৃষ্ণ সোজাসুজি বললেন—'উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেইরূপ উত্তম থাকেরও আচার্য্য আছেন। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্যন্ত করেন' (১।১১।৫)।

এ যে বিষম বিপদ দেখতে পাই! আপ্ত বলে যাঁদের ধরব তাঁদের মধ্যে গুরুর আচার আচরণ নিয়ে এত মতদ্বৈধতা? তবে উপায়? উপায় কিন্তু গুরুই। 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোনও ভাগ্যবানে' —তাহলে অন্তর্যামীরূপে গুরুই তার চোখ খুলে দেন। ব্রহ্মকোটী পুরুষের আপাত দৃষ্ট যত কিছু স্বৈরাচার দেখেও শিষ্য তাঁকে 'সদ্‌গুরু' বলে চিনতে পারেন। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ঘোষণা করেন 'এমন গুরু কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি' 'মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরু'—কেবল এই

বিচারে নয় গো, আমার গুরু সত্যই পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য—ভাগবতে যে দুটি সংজ্ঞা বিশেষ করে জগদগুরুরই বিশেষণ। ‘সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই’—মহাপ্রভুর পরিকররা যেমন বললেন বুক ঠুকে। তেমনি ‘কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়’ সে যে গুরু পেয়েছে তিনি শুধু “জীব ব্রহ্ম এর” এই দিক থেকে সদ্‌গুরু নন্। ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হয়ে যান’ এই শ্রুতিসিদ্ধান্তের মূর্ত্ত প্রতীক তিনি। গীতা-প্রবক্তা যেমন নির্দ্ধিধায় বলেছেন—‘ভজস্ব মাম্’, তেমনি আত্মবাদী হয়েই তাঁর গুরুও অসংশয়িত চিত্তে বলছেন ‘মামেকং শরণং ব্রজ’। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন ‘শুকদেব জ্ঞানী নন্ গো জ্ঞানের ঘন মূর্ত্তি তিনি ব্রহ্মর্ষি’ (কথামৃত ২য় খণ্ড)। ওই থাকে সদগুরুকে যাঁরা চেনেন তাঁরা তেমনি বলেন ‘ঠাকুর নিগমানন্দ সাক্ষাৎ গুরুব্রহ্ম’।

ঠাকুর নিগমানন্দ বার বার বলেছিলেন ‘আমি অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম প্রচার করতে এসেছি।’ তবু তাঁকে নিয়ে একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। সেজন্য দায়ী ওই মধ্যম অধিকারীরা।—যাঁরা কিছুতেই তাঁকে শুধু গুরু বলতে রাজা নন—বিজয় গোঁসাই এর নির্দেশানুযায়ী যাঁরা তাঁকে সদ্‌গুরু বা ব্রহ্মকোটী বলে ভাবতেই সুখ পান। আর দায়ী আমাদের মত অধম অধিকারীরা। গীতা প্রবক্তার ‘অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ’ এই তিরস্কারের লক্ষ্য তা অস্বীকার করি না। কারণ, নির্বিশেষ গুরুতত্ত্ব আমাদের ধারণা হয় না। ব্যক্তি আমাদের চাই-ই, চাই একটি মহাপুরুষকে। সুতরাং কোন মতে যদি একবার মাথায় ঢোকে সদ্‌গুরু বলতে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন আর আমার ঠাকুর সেই সদগুরু তাহলে আর কথা নাই। অধম অধিকারীরা প্রাণপনে ব্যক্তির নামরূপকেই আঁকড়ে ধরে। ‘ওরে, তোদের জগৎ-চিন্তামণি নয়, আমার গোপালের কথা বলছি’—অবোধিনী যশোদা মায়ের মতই তাদের প্রাণ কাঁদে ওই একটি বিশেষ মানুষের জন্য। তবে এটুকু তারা জানে, সে মানুষটি

আর দশজনের মত নয়। সে সত্যের মানুষ, 'সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।' সে মানুষের যে সব গুণ তারা দেখে তাতে অনায়াসে বলা যায় 'মানুষে এমন গুণ কভু না দেখিএ।' সে দিক থেকে মধ্যম অধিকারীরা অধম অধিকারীদের নমস্য। প্রকৃত মুমুক্ষু সত্যানুসন্ধিৎসু গুরুভক্ত শিষ্যরাই বাকী সকলকে গুরুর ব্যক্তিরূপের উপাসনায় প্রেরণা যোগান।

গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে শ্রীভগবান ব্যক্ত ও অব্যক্ত বা মূর্ত ও অমূর্ত ব্রহ্মের পার্থক্য পরিষ্কার ধরিয়ে দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিকেই ধরতে উপদেশ করেছেন। ব্যক্তি সেখানে অব্যক্তের মূর্ত্তিমন্ত বাস্তবতা। আর ভাগবতে তো শুরু থেকেই এক মূর্ত ব্রহ্মের জয় জয়কার। প্রশ্ন উঠতে পারে, অবতারের যা প্রাপ্য তা সদ্‌গুরুকে দেওয়া যায় কিনা। কেনই বা না যাবে? সদ্‌গুরু যে ক্ষেত্রে স্বমুখে বলছেন 'সদ্‌গুরু আর জগদ্‌গুরু মূলতঃ এক। জগদ্‌গুরুর ইচ্ছা যেমন স্থূলে মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করে (অবতার) তেমনি শুদ্ধ আধারেও প্রতিফলিত হয় (সদ্‌গুরু)। তত্ত্বতঃ সদ্‌গুরু ও অবতারে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তবে কার্যতঃ আছে' (জীবনী ও বাণী) সেক্ষেত্রে আমরা তাঁর ব্যক্তি রূপকে আঁকড়ে না ধরব কেন? ভাগবতের নারদ-বাক্য হতে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলব, তপস্যা-বিদ্যা ও সন্তোষ সহায়ে যিনি বেদজ্ঞান ধারণ করে থাকেন সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই সর্বাধিক পূজার পাত্র। ভাঃ ৭।১৪।৩৬)। তার কারণ 'যস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ। পুনন্ত পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ' (ভাঃ ৭।১৪।৪২)॥ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরও পরম দেবতা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অর্চনা সম্বন্ধে ভাগবতে উদ্ধবকে যে নির্দেশ দিয়েছেন 'সদ্‌গুরু' সম্পর্কেও তা অবশ্য প্রযোজ্য (ভাঃ ১১।২৯।১০-১১)। এসবও বলতে পারি মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিষ্যভক্ত নিয়ে গড়ে ওঠা নীলাচল সারস্বত সঙ্ঘের ওড়িশায় বিরাট অভ্যুদয়ের মূলে কিন্তু এই ভাগবতী দৃষ্টিতে ঠাকুর নিগমানন্দের প্রচার।

সম্যক তাঁর তত্ত্ব না জেনেও যারা ভক্তিভরে 'সদ্‌গুরু'কে আশ্রয় করে, ফলের বেলায় তারা নিশ্চয়ই ঠকে না। উত্তম বা মধ্যম অধিকারীর সমান গতিই পায়। আদত কথা হ'ল ভাবের ঘরে চুরি' না থাকে। ব্যক্ত হ'ক আর অব্যক্তই হ'ক—গুরুকে ঠিক ঠিক যে ধরে, গীতোক্ত ভক্ত-লক্ষণ ক্রমে তার মধ্যে ফুটবেই। যদি না ফোটে? তা হ'লে বুঝতে হবে 'গোড়ায় গলদ' আছে কিছু

দীর্ঘ ভূমিকান্তে এবার আসল কথায় আসি। সদ্‌গুরু নিগমানন্দের জীবন প্রসঙ্গ আর্যদর্পণে বার বারই আলোচিত হয়েছে। কতবার কতজন কতভাবেই না তাঁর কথা বলেছেন ও বলছেন। তবু সেই বহুশ্রুত বহুকথিত বিষয় আবারও লেখা বা শোনা কেন, বাইরের লোকের মনে এমন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। সেখানে আমি বলতে চাই—নির্বিশেষের নামরূপ নাই। কাজেই তিনি 'একরূপ, অ-রূপ নাম বরণ' ইত্যাদি। কিন্তু ব্যক্তিকে যারা ধরে তারা ব্যাকুল হয়ে ব্যক্তির জীবনের নানা খুঁটিনাটি শোনে, শুনে সুখ পায়। তাদের ঠাকুর করে কোথায় কি করেছিলেন যত সামান্য হ'ক সে সব ফিরে ফিরে শুনতে তাদের বড় ভাল লাগে। ভাল লাগে ভক্তসঙ্গে তাঁর নানা ক্রিয়া কলাপের বিবরণ। নতুন কথা এতটুকু পেলেও তাদের মন সাগ্রহে তা খুঁটে নেয়। জানতে চায় ঠাকুর কি খেতে ভাল বাসতেন, কি পরতেন, কিভাবে থাকতেন, দিনচর্যা কেমন ছিল তাঁর. উত্তমাধিকারীর কাছে এসব অবান্তর – হয় তো হাসির কথা। কিন্তু সবিনয়ে বলব সবাই উত্তমাধিকারী নয় এ ভুললে চলবে না।

ভাগবত লেখা হয়েছিল ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লেখনীতে। সেখানে তাই ব্যক্তির চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক ভাব-রূপই বড় হয়ে উঠেছে। ভাগবতকে প্রণাম জানিয়ে বলি, তার ফলে ব্রজের সেই সহজ মানুষটিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তবে আজও আমাদের প্রাণ কাঁদে। জানতে সাধ যায় সত্যি সত্যি শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রংটি কেমন ছিল—মানুষের তো আর নীল রং হয় না! আর তিনি আর্য-

বংশোদ্ভব যখন, কুচকুচে কাল ছিলেন না নিশ্চয়ই। খুঁজে খুঁজে দেখি কিশোর কানাই কি খেত, কি পরত, কি কি দুষ্টামি করত। জনশ্রুতিতে তার হদিশ ছিল, ছিল মথুরামণ্ডলের সর্বসাধারণের মুখে মুখে, হাজারো প্রবাদে ব্রজবাসীদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যে। আমাদের প্রাণের চাহিদা বুঝেই যেন শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রচার সচিব রূপ সনাতনকে সে সব সংকলনের আদেশ দেন। দুই গোস্বামী মথুরামণ্ডল চুঁড়ে ওই রকম সূত্র হতে খুঁটে তুলেছিলেন ব্রজরাখালের জীবনযাত্রা। তারই ফল শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ-দীপিকা, ভাগবতামৃত উজ্জ্বল-রস-চিন্তামণি, গোবিন্দ-লীলামৃত, উদ্ধব-সন্দেশ ইত্যাদি গ্রন্থ। পুরীধামে জগন্নাথের যে দৈনন্দিন সেবা—ওটি শবরদের কাছ হতে নেওয়া। ভক্তের অনুমান ওটি সেই ব্রজধামে রাম কানাইয়ের সেবাবিধি ও ভোগরাগের স্মৃতি অবশেষ। চৈতন্য মহাপ্রভু অন্ততঃ সেই ভাবেই দেখতেন।

বুদ্ধ শঙ্কর এঁরা জ্ঞানযোগী। মানুষ শঙ্করকে তো আমরা প্রায় হারিয়েই ফেলেছি। মহাস্থবিররা বুদ্ধের সহজ ভাবটিও চাপা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর 'আনন্দ' এবং গৃহী ভক্তরা প্রাণের ঠাকুরকে ধরে রেখেছিলেন। তাই বুদ্ধ চরিত ও জাতকগুলিতে মহামানব বুদ্ধের অসংখ্য স্মৃতি-চিত্র আমাদের চিত্তকে প্রমুদিত করে। ভয় হয় ঠাকুর নিগমানন্দও কি কোনও দিন তাঁর তত্ত্ব-মুর্ত্তির আড়ালে হারিয়ে যাবেন? যোগমায়ার ইচ্ছা হলে হয়তো যাবেন। কিন্তু তাব আগে যতদিন বেঁচে আছি—আমরা আমাদের মানুষ ঠাকুরটির চরিত প্রসঙ্গ শুনি, বলি আর লিখি। ও ছাড়া আমরা আর কি বুঝি?

আমার মত যাঁরা মানুষটির খবর জানতে উৎসুক, যাঁরা মানুষটির কথাই নানারকমে শুনতে চান আজ আমি তাঁদের গুটি দুই নতুন খবর দেব। সবাই তাতে রস না পেলেও দু'চার জন কিন্তু পাবেন। মনে আশা, অনেক অনেক বছর পরে শ্রীনিগমানন্দ যখন পূর্ব ভারতে

সূর্য্যের মত স্বমহিমায় প্রকটিত হবেন, তখন আমাদের মত যারা, তারা এই সব সামান্য কথাতেই 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

শ্রীনিগমানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁর প্রাচীন শিষ্যরা অনেকেই এটা তাঁর মুখে শুনেছেন। সেই সাক্ষাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্বন্ধে কি বলেছিলেন জানতে সাধ হয় না? শ্রীনিগমানন্দের সুপ্রাচীন গৃহী শিষ্যদের অন্যতম ৺যোগেশ্বর গাঙ্গুলীর স্মৃতি-কথায় তা ধরা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শ্যামপুকুরে অসুস্থ। ভুবন মোহন ভট্টাচার্য্য বড় ছেলেকে নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে যান। বালক নলিনীকান্তকে দেখেই পরমহংসদেব উঠে কাছে এসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন 'আহা! ছেলেটি তো বেশ! আপনার ছেলে?' ভট্টাচার্য্য মশাই বললেন 'আজ্ঞে হাঁ'। পরমহংসদেব বললেন 'বেশ, বেশ। ভরা কলসী দেখেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। আর, খুব জোরে ধাক্কা মারলেও নাড়াতে পারা যায় না। লোক সংসার করে, সংসার ভরে ছেলে মেয়ে রেখে যায়। আমি তো আর সংসার করিনি! আমি কাদের রেখে যাব, অনেক সময় বসে ভাবি। দেখি, চিন্তার কোন দরকার নেই, যাঁর কাজ তিনিই করছেন। মানুষ তার একটু খানি সংসারের চিন্তা করে অস্থির হয়ে যায়। আর তিনি এই বিরাট সংসার করছেন। কোথাও একটু ত্রুটি নেই, ভুল নেই........' বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হলেন। কিছুক্ষণ এ অবস্থায় কাটবার পর গদগদ কণ্ঠে বললেন 'জন্মান্তরে যারা সব সেরে আসে তাদের বেশীদিন বড় কিছু করতে হয়না। আপনিই যেন সব যোগাড় হয়ে আসে। একে দেখে আজ বড় খুশী হলাম। সংসারে যাবে না গো যাবে না।' বলে নলিনীকান্তের গায়ে মাথায় আবারও হাত বুলাতে বুলাতে বললেন 'মাঝে মাঝে একে এনে আমাকে দেখিয়ে যেও।'

এই হেঁয়ালীর মত অসংলগ্ন রহস্যোক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্‌ ভঙ্গি। কথামৃতে এর স্বাক্ষর রয়েছে। বিবরণটুকু পড়ে আমাদের মন আনন্দে

ভরে ওঠে। ঠিক এমনি প্রত্যাশাই মনে ছিল, যে কেউ না চিনলেও শ্রীরামকৃষ্ণ নলিনীকান্তকে নিশ্চয়ই চিনেছিলেন। যোগেশ্বরদা তার প্রমাণ রেখে গেছেন। আচ্ছা, পরে শ্রীনিগমানন্দ এসব আর কাউকে বলেন নি কেন? হয়তো বুঝেছিলেন ও বলা নিরর্থক। আমি নিজেই নিজের পরিচয়! 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ........।' যারা আমায় চিনবে তাদের আর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে শুনে চিনবার প্রয়োজনে কি? মহাপুরুষ মাত্রেই 'সংযতবাক্' এবং নিজের সম্বন্ধে তাঁরা আরও স্বল্প ভাষী। আরও একটা কারণ থাকতে পারে। অনুভবী মাত্রেই জানেন মহাপুরুষের পক্ষে ধ্রুবা স্মৃতিই মুখ্য। দৈনন্দিন সুখদুঃখ যাঁদের প্রতিক্ষণেই 'অপার সম্বিত সুখ সাগরে' ডুবে যায়, তাঁদের পক্ষে গত জীবনের খুঁটিনাটি মনে রাখা তো বিড়ম্বনা। শ্রীনিগমানন্দ এক জায়গায় বলেছেন 'আমি যখন যে সাধনা করেছি তার পূর্ব্বের কথা সবই যেন তখন ভুলে গেছি।' একাগ্রভূমিক সমাহিত চিত্তের লক্ষণ এই ধ্যাননিষ্ঠ শরবৎ তন্ময়তা। কাজেই ব্রহ্মানন্দাস্বাদে বিভোর থেকে যত দিন গেছে শ্রীনিগমানন্দ ততই তাঁর পূর্ব জীবনের খুঁটিনাটি বিস্মৃত হয়েছেন। মোটা কথাগুলি কেবল তাঁর চিত্তে জাগ্রত। এইজন্য বিভিন্ন ভক্তের সংগৃহীত তাঁর জীবন কথায় তথ্যের নানা বিভিন্নতা চোখে পড়ে। পাঠককে সব বিবৃতি মিলিয়ে সত্যাবধারণ করতে হবে।

যোগেশ্বরদা ১৩১৫ সালে দুর্গাপুর আশ্রমে শ্রীনিগমানন্দের কাছে যান। তখনও পুর্ব্বস্মৃতি শ্রীনিগমানন্দের মনে অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তাই ঐ সময়ের ভক্তদের বিবরণীতে আমরা কিছু কিছু নতুন খবর পাই। আর একটা ছোট্ট খবর এই সঙ্গে দিই। যদিও অতি সাধারণ তা, তবু আমাদের কাছে ফেলনা নয়।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করার দুবছর পরে নলিনীকান্ত ঢাকায় পড়তে যান। কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় সেখানে কোথায় থাকতেন? যোগেশ্বরদা লিখছেন, তিনি থাকতেন ঢাকা পটুয়াটুলি

ব্ল্যাকম্যান কোম্পানীর উপরের মেসে। ওই মেসে তাঁর দৈনিক ব্যয় ছিল তিন পয়সা।

নলিনীকান্ত বাঙ্গালীর ছেলে—মাছে রুচি তাঁর স্বাভাবিক। কথায় বলে 'মাছে ভাতে বাঙ্গালী'। আবার তাঁর বিশেষ রুচি ছিল ইলিশ মাছে। পশ্চিম বঙ্গে এটা কিন্তু বিরল। তবে কি নলিনীকান্তের এ রুচি ব্রহ্মানন্দ গিরিব সংস্কার বিশেষ? আমরা জানি গিরি মহারাজই প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে কুতুবপুরে নলিনীকান্ত রূপে দেহ ধারণ করেছিলেন। এই ইলিশ মাছ খাওয়া নিয়েই তাঁর ঈপ্সিতা ভার্য্যা, সাধনার ধন ছদ্মবেশিনী ভগবতীকে সেবার তিনি হারিয়েছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ পূর্ব্ববঙ্গ প্রবাসের স্মৃতি বহন করেই নলিনীকান্তের মধ্যে বুঝি ইলিশ মাছে প্রীতিটি ফুটেছিল। ঠিক যেমন তাঁর কপালের ডান দিকে একটি জন্মদাগ নিয়ে নলিনীকান্ত জন্মেছিলেন! ওই দাগটি পূর্বজন্মে সদ্যোজাত ব্রহ্মানন্দের তিলখেতের তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটায় বিদ্ধললাট শূন্য মাঠে রক্তাক্ত দেহে পড়ে থাকার স্মৃতি বহন করে এবার তাঁর ললাট প্রান্তে চিহ্নরূপে ফুটে উঠেছিল।

যা বলছিলাম। ঢাকায় থাকা কালে পদ্মার স্বাদু ইলিশের স্বাদ অপূর্ব বোধ হলেও তা নলিনীকান্তের কাছে সুলভ ছিল না। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বিদেশে পড়েছেন কায়ক্লেশে। দিদিমারা বিত্তবতী হলেও পারিবারিক কারণে তঁদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কাজেই সামান্য খরচে সস্তায় খাওয়া সারতে হত। বাঁধা বরাদ্দ এক টুকরা ইলিশ মাছ! নলিনীকান্ত সেটি থালার একোনা হতে ওকোনায় সরিয়ে, বলতে গেলে মাছটি কেবল চোখে দেখে ও তার ঘ্রাণ নিয়েই মাছের ঝোল দিয়ে বেশীর ভাগ ভাত খেয়ে নিতেন। শেষ ভাত কটি খেতেন মাছের টুকরাটি দিয়ে।

ছাত্রজীবনে তাঁর সুশীলতা অধ্যবসায় কৃচ্ছ্রতা ইত্যাদি বহুগুণের এ'ও একটা দিক। ফরিদপুরের যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন সে সময় নলিনী কান্তের সহপাঠি ছিলেন। ১৩৪০ সালে ঘড়িসার বিভাগীয়

সম্মিলনীতে তিনি এসে শ্রীনিগমানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর মুখ হতে যোগেশ্বরদা প্রমুখ উপস্থিত শিষ্যভক্তরা ছাত্র নলিনীকান্তের দিন-যাত্রার বিবরণ শুনে মগ্ন হয়ে যান। 'উঠন্তি মূলা পত্তনেই চেনা যায়।'

যে দুটি তথ্য পরিবেশন করলাম তারা জাতে আলাদা। একটিতে তাঁর দিব্য মহিমার স্বীকৃতি, অন্যটিতে মানুষটির একটু পরিচয়। কিন্তু দুইয়ে মিলে অখণ্ড 'শ্রীনিগমানন্দ'—তিনি একটি 'ব্যক্তি'—নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধরূপ সদ্গুরু নিগমানন্দ। তাঁকে আমরা অন্ততঃ নির্বিশেষ গুরুতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে পারিনা। বলি, তিনি সবিশেষ আবার নির্বিশেষ। বলি, ব্রহ্ম ওই আধারে সগুণে সাকারে নেমে এসেছেন আমাদের জন্য। কীর্তনীয়া যেমন 'বাল-গোপালের' হামা দেওয়ার কথা বলতে বলতে আখর দেন—

'নন্দের আঙ্গিনা পরে—
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি হামাগুড়ি দিয়া ফেরে।'

তত্ত্বজ্ঞানীর কি মনে হয় বলতে পারিনে। আমাদের কিন্তু তাতে, ওই হামা-টানার কাণ্ডটা আরও মিঠে লাগে।

বস্তুতঃ অবতার ও সদ্গুরুর এই-ই তো বৈশিষ্ট্য। তাঁরা মানুষ হয়েও মানুষ নন্। আর ঠিক ওই জন্যই এ দুই তত্ত্ব সবচেয়ে দুরবগাহ। 'চোদ্দ পোয়ার মধ্যে অনন্ত'! এ ধারণা করা কি সহজ গা? কিন্তু কখনো কখনো চোদ্দ পোয়ায় অনন্ত ধরা দেন। আমাদের ভাগ্যেও দিয়েছিলেন। 'মোদের গুরু জগৎ জোড়া' তা সত্য। ভাগবতে অবধূতের চব্বিশ গুরু। কিন্তু সদ্গুরু নিগমানন্দ ব্রহ্ম কোটি পুরুষ; তাঁর দেহ ও দেহী অভিন্ন, চিন্ময় তত্ত্ব। 'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'। আর সত্য বলতে কি এই সদ্গুরুই আক্ষরিক অর্থে পূর্ণব্রহ্ম। তার কারণ, চতুষ্পাদ ব্রহ্মের চার পো বোধ—জীব হতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত চার ভূমির সম্যক জ্ঞান এক ওই 'নরাকার পরব্রহ্মের'ই আছে। নির্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ সুপ্ত। ঈশ্বর 'অনন্ত কোটী

ব্রহ্মাণ্ডের গতিভর্ত্তা 'প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং' সুহৃৎ হয়েও জীব ভাবের সঠিক খবর জানেন না। জানতে গেলেই তাঁকে ঈশ্বরত্ব হতে চ্যুত হতে হবে। শ্রুতির দুটি পাখীর উপমা স্মর্তব্য। একজন কটু পিপ্পল খাচ্ছেন অন্যে কেবল চেয়ে দেখছেন। কিন্তু ওই পিপ্পল আর 'দেবমধু' এক দেহে আস্বাদ করে যিনি যুগপৎ' পিপ্পনাদ' ও 'মধুবদ' তিনি এই সদ্‌গুরু। শাস্ত্রে তাই 'সদ্‌গুরুর' এত মহিমা—সন্ত সমাজে এত মান! শ্রীনিগমানন্দযে বলেছিলেন 'পর অবর সব—পরাবর ব্রহ্মই হয়ে গেলাম'—এ কিন্তু সদ্‌গুরু ছাড়া অন্যে বলতে পারেন না।

উপসংহারে তাই ঠাকুর নিগমানন্দের চরণাশ্রিত বিরাট সারস্বত সঙ্ঘকে করজোড়ে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে বেদগর্ভের 'সূক্ত' দিয়ে অভিনন্দিত করি—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দ গোপব্রজৌরসাম্।
যন্মেত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

(ভাগবত ১০।১৪।৩২)

শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের মহিমা

উৎকল ভূমিতে বেদ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, গীতা ও ভাগবত ধর্ম, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদার দার্শনিকতা, তন্ত্র-মতাশ্রিত সহজিয়া ধর্ম অথবা সহজযান ও বজ্রযান এবং পরবর্ত্তী কালে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ও শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম আশ্চর্য্য সমাদরে সমাদৃত হয়েছিল। প্রকৃত হিন্দু যিনি তিনি জানেন এই সমস্ত মতবাদ অখণ্ড সনাতন ধর্মের বৈচিত্র্য মাত্র। সুতরাং উৎকল ভূমি যে যথার্থ সনাতন ধর্ম কি তা হৃদয়ঙ্গম করেছিল উপরোক্ত তথ্য হতে সহজেই সেটি প্রমাণিত হয়।

বন্যার জল চারিদিক ভাসিয়ে কত কিছু ধুয়ে আনে। আব স্রোতের টান কমে গেলে জল সরে যায়। কিন্তু পলিমাটিতে সব কিছুব সার থাকে। শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমধাম ঠিক তেমনি ভাবতেব প্রতিটি ধর্ম প্লাবনেব পলি বুকে ধরে রেখেছেন। শবব জাতির মূর্ত্তি উপাসনা হতে, উপনিষদের প্রতীক উপাসনা, আবার সাংখ্যের ত্রিগুণ তত্ত্ব, বৌদ্ধের ত্রিশরণ তত্ত্ব—এ সমস্ত কি করে যে এখানকার ক্ষেত্রাধীশ পুরুষোত্তম বিগ্রহে প্রকটিত হয়েছে সে এক অদ্ভুত রহস্য। আবার তার সঙ্গে মিশে আছে আগমের পীঠতত্ত্ব। শ্রীক্ষেত্রের আচার-অনুষ্ঠানেও দেখি বৈদিক যজ্ঞ-বিধি ও স্মৃতি (পণ্ডিত সদাশিবের প্রবন্ধ —'সমাজ' তাং ২৬।৬।৬০) শাস্ত্রাদির বিধান যেমন গৃহীত হয়েছে তেমনি লোকধর্মকেও অনাদর করা হয় নি। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, ব্রাহ্মণ সুপকারে অশেষ সাবধানতায় ভোগ বাঁধে, কিন্তু আনন্দবাজারে ছত্রিশ জাতি শুধু নয়, কুকুরে এবং ব্রাহ্মণে একই পাত্র হতে অন্ন প্রসাদ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে। এগুলি কি জনপ্রিয় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব নয়? এইসব ধর্মে জাতিভেদ প্রথা স্বীকৃত ছিল না। বেদমন্ত্রে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ বিগ্রহকে রথযাত্রার সময়ে তিন দিন জাতিবর্ণ নির্বিশেষে আচণ্ডাল সবাই কোল দেয়। রথযাত্রার উৎসবে শবর পাণ্ডারাই অগ্রগণ্য।—ওই সাতদিন বেদ-শাসিত শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ বা বামনদেব সত্যই জগবন্ধু পতিত

পাবন রূপেই দেখা দেন। অথচ অন্য সময়ে সামান্য এতটুকু অনাচার বা স্পর্শদোষ ঘটলে তাঁর ভোগ নষ্ট হয়। অপরাধীর অর্থদণ্ড এমন কি ক্ষেত্র-বিশেষে প্রাণহানিও সম্ভব।

এই যে কঠোর রক্ষণশীলতা আর উদার মানবতার (Humanity) সমন্বয়—পুরীধামের এই বৈশিষ্ট্য বিরাট বিশাল হিন্দুধর্মের সনাতন চরিত্রকে নানাদিক হতে স্পষ্ট করে তুলেছে। যিনি জ্ঞান যোগ তন্ত্র ও প্রেমভক্তি সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সার্বভৌম গুরুরূপে সনাতন ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন সেই সদ্‌গুরু শ্রীনিগমানন্দদেব এইজন্যই শেষ জীবনে পুরীধামে তাঁর আসন পেতেছিলেন।

শ্রীনিগমানন্দ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী না তান্ত্রিক, অথবা শৈব যোগী না বৈষ্ণব তা কেউ বলতে পারবে না। আমরা জানি তিনি নিরাকার পরব্রহ্ম, সংহিতার ভাষায় 'অর্দ্ধদেব' বললেও হয়ত তাঁর তাত্ত্বিক পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর প্রকৃত পরিচয় কেবল সনাতন ধর্মের গুরুবাদে।

এইখানে একটা কথা আছে। গুরুবাদ বা গুরুব্রহ্মবাদ আমাদের মতে একই কথা। কারণ শ্রীনিগমানন্দদেব বলেছেন "সৎ শব্দ গুরুর বিশেষণ নয়,'সদ্‌গুরু' এক কথা। নির্বিকল্প সমাধি-ব্যুত্থিত না হলে তাঁকে সদ্‌গুরু বলা হয় না।" (জী. বা. ২৫২ পৃঃ) অর্থাৎ "ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি।" তিনি আরও বলেছেন "আতসী পাথরে কেন্দ্রীভূত সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যই—সূর্য্যের প্রতীক নহে।" অর্থাৎ, সদ্‌গুরু কারও প্রতীক নহেন- তিনি নরাকার পরব্রহ্ম স্বয়ং।

গুরুবাদ বৈদিক যুগ হতে স্বীকৃত ছিল। বৈদিক যুগে অধ্যাত্ম সাধনার মূল কথা ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞশ্রেষ্ঠ সোম যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক ছিলেন ব্রহ্মা, (ঋ. সং. ১০।৭১।১১)। তিনিই 'সমগ্র বেদ-বিদ্যার ধারক ও প্রকাশক'। তিনি একাধারে জ্ঞান ও শক্তির মিলিত বিগ্রহ। যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ বা ব্রহ্মবিদ্‌ত্তম তিনিই ব্রহ্মা হবেন (আপস্তম্ব-শ্রৌত সূত্র ৩।১৮।১)। কাজেই ব্রহ্মবিদ্‌ হলেই 'ব্রহ্মা' হওয়া যায়

না। বৈদিক ব্রহ্মা বা সদ্‌গুরুর থাক আলাদা। সুতরাং 'সদ্‌গুরু' এবং 'ব্রহ্ম' সমার্থক শব্দ। তাই বলছি সারস্বত সঙ্ঘে 'গুরুবাদ' বা 'গুরুব্রহ্মবাদ' একই কথা। গুরু অর্থে আমরা 'নরাকার পরব্রহ্ম' বুঝি। সদগুরু নিগমানন্দদেব সেই 'নরাকার পরব্রহ্ম'।

বৈদিকদের 'ব্রহ্ম' যে পরবর্ত্তী কালের সদ্‌গুরু বা নরাকার পরব্রহ্ম স্বরূপ ছিলেন, সেটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্য কয়েকটি বৈদিক তথ্য প্রমাণ স্বরূপ নীচে দেওয়া হল :—

(ক) ব্রহ্মা যজ্ঞশ্রেষ্ঠ সোমযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। অন্য সমস্ত ঋত্বিক বা ব্রাহ্মণবৃন্দ প্রতি কার্য্যে তাঁর অনুমতি চাইতেন। এবং তিনি কেবল বলতেন 'ওম্'। 'ওঁ' কার সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্ম বা ব্রহ্মবাচী বাক্। বেদে ব্রহ্মশক্তি বাক্ পদবাচ্য। বৈদিক ব্রহ্মা একাধারে মহাজ্ঞান ও মহাশক্তির আধার। সদ্‌গুরু বা 'নরাকার পরব্রহ্ম' শক্ত্যালিঙ্গিত শিব। মহাশক্তি বা সগুণ ব্রহ্ম যাঁকে 'স্বামী' বলে মান দেন শাস্ত্রমতে তিনিই জগদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু তাঁর মর্ত্ত্যতনু বা নরবিগ্রহ। শ্রীনিগমানন্দদেব বলেছেন 'সদ্‌গুরু আর জগদগুরু মূলতঃ এক।' প্রথমে নির্গুণ ব্রহ্ম। তিনিই গুরু। তাঁর ইচ্ছা হল লীলা করবেন। লীলা একা হয় না। তাঁর ইচ্ছামাত্রে তাঁর শরীর হতে মায়ের উদ্ভব হ'ল। এই মা-ই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর…। মায়ের তপস্যায় নির্গুণ ব্রহ্ম গুরু হয়ে সাকারে নেমে এলেন। (জী. বা. ১২৭ পৃ :

অন্যত্র বলছেন—স্বয়ং জগজ্জননী নিজে গুরু না হইয়া জগদগুরুর দাসীত্ব স্বীকার করিয়া বরণীয়া ও মহনীয়া হইয়াছেন। (জীবনী ও বাণী, প্রথম পৃষ্ঠায় ঠাকুরের চিঠি)।

সুতরাং ব্রহ্মবিদ্ হলেই ব্রহ্মা হওয়া যায় না। যিনি একাধারে জ্ঞানবান ও শক্তিমান, শক্তি যাঁহার করায়ত্ত তিনিই বৈদিক 'ব্রহ্মা'।

(খ) এই বৈদিক 'ব্রহ্মা' যে পরবর্ত্তী কালের সদ্‌গুরু বা 'নরাকার পরব্রহ্ম' তা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।৭।৬) আরও পরিস্ফুট হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যজমান ব্রহ্মাকে যজ্ঞের পৌরহিত্যে বরণ করার

পর তিনি জপ করেন—"অহং ভূপতিঃ, অহং ভুবনপতিঃ, অহং মহতো ভূতস্য পতিঃ····বৃহস্পতি দেবানাং ব্রহ্মা অহং মনুষ্যানাম"। অর্থাৎ ব্রহ্মা বলছেন তিনি তিন লোকের অধীশ্বর। বৃহস্পতি যেমন দেবগণের গুরু, তিনি তেমনি অখিল মানবের গুরু। বৈদিক সাহিত্যে বৃহস্পতি বা বাচস্পতি শব্দের অর্থ স্বয়ং ব্রহ্ম বা বাকের পতি। বেদে বাক্ হলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি স্বরূপা, (ঋক্ সংহিতা ১৭।১১৪।৮) 'ব্রহ্মা' এই বৃহস্পতি বা বাক্পতি ব্রহ্মের মর্ত্ত্যবিগ্রহ। তাই জ্ঞান ও শক্তির মিলিত বিগ্রহ বৈদিক 'ব্রহ্মা'ই পরবর্তীকালে সনাতন ধর্মে— "জ্ঞানশক্তি সমারূঢ় তত্ত্বমালা বিভূষিত "নরাকার পরব্রহ্ম" বা 'সদ্‌গুরু' রূপে দেখা দিয়েছেন।

(গ) গুরু সংজ্ঞাটি অবৈদিক নয়। মুণ্ডক (১।২।১২) ছান্দোগ্য (৮।১৫।১) এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।২১) গুরু সংজ্ঞাটি আছে। গুরু যে জ্ঞানদাতা ও শক্তি সঞ্চারকারী ব্রহ্মকোটি পুরুষ, তা বৈদিক ঋষি সম্প্রদায়ে স্বীকৃত ছিল।

ইতিহাস পুরাণে বেদব্যাস এক ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে ব্রহ্মা পদবী দিয়ে গুরু তত্ত্ব বুঝাতে কেবল 'গুরু' বা ভগবান সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা 'জগদ্‌গুরু ও সদ্‌গুরু'তে ঈষৎ পার্থক্য করতেন বলে 'ব্রহ্মা' ও 'ব্রহ্ম' দুইটি সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন। ব্যাস "স্বয়ং ভগবান" শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে তাঁর কাছে শ্রীনিগমানন্দদেবের মতই সদ্‌গুরু ও জগদ্‌গুরু মূলতঃ এক। তাই তিনি সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু, ব্যাসদেব ভগবান ও ব্রহ্মাকে একই বলেছেন (ভাঃ ১।১।২)

সদ্‌গুরু তাঁর মর্ত্ত্যতনু বা নরবিগ্রহ। শ্রীনিগমানন্দ ঠিক তাই বলেছেন। তবে তিনি আবার সদ্‌গুরু ও অবতারের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তা ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

হিন্দু ধর্মের গুরুবাদ এক গভীর রহস্য বা গুহ্য তত্ত্ব। উপনিষদে আছে—সাধনার চরম সিদ্ধি কি, সে কথা লুকানো আছে



পরমহংস শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী

ইতিহাস পুরাণে উল্লিখিত সাধন পন্থায়। যাঁরা সেটিও আয়ত্ত করেন পরিণামে তাঁহাই গুহ্য আদেশ বা মহাবাক্য সহায় ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন। (ছাঃ উঃ ৩।১১)। পুরুষোত্তমধামে যেমন বৈদিক ও লোক ধর্ম বা অবৈদিক ধারার মিলন ঘটেছে জানা যায়, হিন্দুর গুরুবাদে তেমনি বৈদিক ও অবৈদিক ধারার পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছে। এই জন্যই তা গুহ্যতত্ত্ব।

ব্যাস বলছেন "গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষাত শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিত" (মহাভারত শাঃ পর্ব ২৯৯ অঃ)। তোমাকে গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি, মানুষ হতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই। বাংলার বৈষ্ণব মহাজন চণ্ডীদাস এই কথা স্মরণ করে লিখেছেন—"শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।"

এই গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপ মানুষ কে? ব্যাস কার কথা বলছেন? বাশুলী দেবীর কৃপা প্রাপ্ত পঞ্চরসিকের অন্যতম চণ্ডীদাস ঠাকুর কোন্ মানুষকে সত্য মানুষ বলছেন্? ইনিই সদ্‌গুরু। ঠাকুর নিগমানন্দদেব বলছেন্—"শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ ও নিত্য। মানুষ মণ্ডলীর আরাধ্য সত্যসিদ্ধ মানুষ; তাই তাহাকে সহজ মানুষ আখ্যা দেওয়া হয়" (প্রেমিকগুরু)। নিগমানন্দদেব তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য ভক্তমণ্ডলীকে বলছেন "আমি সেই নিত্যলোকের পুরুষ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু, শ্রীনিগমানন্দদেব তাঁর নরবিগ্রহ। ভক্ত সমাজ তাঁকে এই ভাবে চিন্তা করবে। —এইটি তাঁর আদেশ ছিল। এইজন্য বলছি হিন্দুর গুরুবাদ এক গভীর রহস্য ও গুহ্যতত্ত্ব। গুরুকৃপা ব্যতীত এই তত্ত্ব সহজে ধারণা হয় না।

বৈদিক ধারা ইতিহাস পুরাণের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে, লোকধর্মে গুরুবাদকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছে। শ্রীনিগমানন্দদেব তাঁর প্রেমিকগুরুতে অজস্র লোকধর্মের নাম করেছেন। এই সমস্ত সম্প্রদায় গুরুবাদী। আবার অবৈদিক ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় বিচার পন্থী সাংখ্যবাদীরাও নিঃসংশয়ে গুরুবাদী। বরং বৈদিক ঋষি সম্প্রদায় অপেক্ষা এই সম্প্রদায়ে মানুষগুরু বা সদ্‌গুরুর মর্যাদা অধিকতর

স্বীকৃত। সাংখ্যমতে ঈশ্বর অসিদ্ধ। কারণ বিচার করিয়া কোন প্রমাণে ঈশ্বরকে ধরা যায় না। কিন্তু জ্ঞান সিদ্ধ সদ্‌গুরু সর্বদা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। আদি বিদ্বান কপিল মুনি এই সম্প্রদায়ের পরমগুরু। তিনিই তাদের ভগবান। আধুনিক যুগে সাংখ্যযোগের আলোচনা করতে গিয়ে আধুনিক ভারতের এক মহামনীষী* তাই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ বিচার করে লিখেছেন :—

"কোন আশ্রমের প্রতি শিষ্যরা যে তত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য আকৃষ্ট হয় তা নয়, তারা আকৃষ্ট হয় গুরুর ব্যক্তিত্বে। তিনি তাদের পথ চলবার আলোক-স্তম্ভ স্বরূপ, (জীবনের ধ্রুব তারা) সত্যের প্রকটবিগ্রহ। সেই জন্যই গুরুর প্রতি শিষ্যের আনুগত্য ও নির্ভরতার কথাটা ওঠে। গুরুর প্রভুত্বের (গুরু গৌরবে) সে ক্ষেত্রে সীমা নাই। সনাতন ধারায় শিষ্যের কাছে গুরুর অকথিত শপথ, "আমি তোমাদের মুক্তিধামে নিয়ে যাব! তোমরা বিশ্বস্তের মত আমার কাজ কর তাহলে মুক্তি তোমাদের করায়ত্ত। পরমাসিদ্ধি তোমাদের করতলগত হবে। সংসার বন্ধন হতে চিরতরে মুক্তি পাবে। আমার যে গতি তোমাদেরও সেই গতি। আমি যদি স্বর্গে যাই তোমরাও যাবে। আমি নরকে গেলে তোমরাও তাই যাবে"।

গুরুর দায়িত্বের সীমা নাই। তাঁর অনুগামীদের সমস্ত কর্মের বোঝা তিনি গ্রহণ করেন। ওদিকে শিষ্যরাও তাদের বোঝা তাঁর ঘাড়ে ফেলে দিয়ে খুসী মনে নিরুদ্বেগে থাকে।'**

---

* সারস্বত মঠের নির্বাণানন্দ সরস্বতী। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুর নির্বাচিত প্রথম মোহন্ত ছিলেন। পরে সাংখ্য ধারায় সাধন ভজন করে নিজে সত্য লাভ করবার আশায় তিনি মঠাশ্রম ত্যাগ করেন। সম্প্রতি তাঁর গুণমুগ্ধ বিদেশিনী শিষ্যা সুপণ্ডিত শ্রীমতী লিজেল রেম "To Live Within" বইয়ে সাংখ্যযোগ লিখে ভারতের সাধন কথা ইউরোপে প্রচার করেছেন।

** To Live Within, P. 138

এই যে গুরুর চিত্র! এ চিত্র কি ঠাকুর নিগমানন্দদেবের চিত্র নয়? তাঁর চিঠি, নীলাচল-বাণী, জীবনী ও বাণী, উপদেশামৃত ইত্যাদি যে সব পুস্তকে তাঁর অমৃতময়বাণী ধরা আছে তার মূল কথা—"তোরা আমার এ পারের কাজ কর তোদের ওপারের ভার আমার।" —"আমার উপর যারা নির্ভর করেছে তাদের আমি হাতে ধরে মুক্তিধামে নিয়ে যাব।" (জীবনী ও বাণী) "আমাকে ধরলে তোমাদের ভিতর গুরু, আত্মা, ভগবানের জ্ঞান আপনিই ফুটে উঠবে।" (জীবনী ও বাণী)—"তোমাদের উদ্দেশ্য কাজ দিয়ে আমার সন্তুষ্টি উৎপাদন করা, আমাকে প্রাণভরে ভালবাসা" (জীবনী ও বাণী)।

দেখা যাচ্ছে বৈদিক যুগ হতে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের শীলিত বুদ্ধি মনীষী সাংখ্যযোগের মত কঠোর যুক্তিবাদী সাধন পন্থার বিষয় আলোচনা করতে গিয়েও গুরুবাদ অস্বীকার করতে পারেন নি।

সুতরাং গুরুবাদ হিন্দুধর্মের সর্ব্বসম্প্রদায় স্বীকৃত মহাতত্ত্ব এবং সেই হিসাবে বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক তত্ত্ব। সদ্‌গুরু নিগমানন্দদেব এই গুরুবাদের মূর্ত্ত প্রকাশ।

শুনেছি একবার ঠাকুর নিগমানন্দ বগুড়া থাকা কালে অগণিত লোক সমাগম দেখে কেহ সবিস্ময়ে তাঁকে বলেছিলেন—"ঠাকুর! এত লোক কি আকর্ষণে আকৃষ্ট হচ্ছে? এরা তো আপনাকে কিছুই জানে না।" ঠাকুর নিগমানন্দদেব স্মিত মুখে উত্তর দিলেন "লোকে গুরু অনেক দেখেছে, কিন্তু ভগবান-গুরু দেখেনি। তাই দেখতে আসছে।"

বলা বাহুল্য শ্রীনিগমানন্দদেব চিঠি পত্রে শ্রীভগবান বলতে জগদ্‌গুরুকে নির্দ্দেশ করেছেন। সুতরাং উপরোক্ত কথাটিতে প্রমাণ হয় তিনি নিজেকে জগদ্‌গুরুর সঙ্গে অভিন্ন বলে ভাবতেন। আমরা সাধারণতঃ যাকে ভগবান বলি সেই সগুণব্রহ্ম বা মহাশক্তি শ্রীনিগমানন্দদেবের কাছে গুরু অপেক্ষা ছোট। প্রমাণ—"এক হিসাবে ভগবানও গুরুর আজ্ঞাধীন।" (জী. ও বা. পৃঃ ৫৪)

তাঁর এই বাণী। তাই তিনি তথাকথিত ভগবান বা সগুণ ব্রহ্মকে নারীভাবে দর্শন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়—শিবাজীর গুরু রামদাসস্বামী ঠিক এই কথাই বলেছিলেন—'শ্রীগুরু ভগবান অপেক্ষাও মহত্তর। যে শিষ্য শ্রীগুরু ও ভগবান এতদুভয়কে তুল্য বলিয়া গণ্য করে সে শিষ্য কুশিষ্য'।

পূর্বেই বলেছি যে গুরু বেদব্যাসই প্রথম গুরুতত্ত্বকে 'ব্রহ্ম' বা 'ভগবান' বলেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত এই ভগবান বা সদ্‌গুরুর মিলিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী বক্ষে ধারণ করে যুগ যুগ ধরে মানবকে ভগবান-গুরু অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করছে। আর বাকবিস্তরণ অনাবশ্যক। ঠাকুর নিগমানন্দ তাই নিজেকে ভগবান-গুরু বা সদ্‌গুরু বলছেন। তাই তিনি বলছেন—"এমন কি আমার এই পচাগলা স্থূল দেহটারও যদি ধ্যান কর তাহলেও একদিন এরই ধ্যানে আমার আসল রূপ তোমাদের ভিতর ফুটে উঠবে।" (জী. ও বা. পৃঃ ২৫১)

শাস্ত্রমতে গুরুশিষ্য ও ভক্ত ভগবান দুই প্রকার সংজ্ঞা আছে। গুরুকে যখন শিষ্য তার ইষ্ট বা ভগবান দৃষ্টিতে দেখে তখন শিষ্য ভক্ত পদবীতে আরূঢ় হয়। এই জন্য শ্রীনিগমানন্দদেব একখানা চিঠিতে লিখেছেন - "মন্ত্র লইলেই শিষ্য হয় না। তোমাদের আমার প্রতি যে ভক্তি আছে তাতে মন্ত্র নেওয়া অনাবশ্যক।"

সুতরাং যারা ঠাকুর নিগমানন্দকে ভগবান গুরু বলে বিশ্বাস করে তাদেব কাছে শ্রীশ্রীনিগমানন্দ বিগ্রহ নরবিগ্রহ হলেও জগদগুরুর সত্ত্বতনু বা সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, ঠিক যেমন আদিবাসী দেববিগ্রহের মত রূপলেশ পরিশূন্য মহাদারু জগন্নাথ হিন্দুর নিকট পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষোত্তম। শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ সারস্বত সংঘের নব জগন্নাথ—কারণ, 'মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ' সদ্‌গুরুকে এই দৃষ্টিতে দেখা সনাতন ধর্মের চিরন্তন গুরুবাদ।

———

শিশু ভোলানাথ

"ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি' আর 'পাকা আমি'। বালক কোন গুণের বশ নয়, ত্রিগুণাতীত।....দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা। রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলা ঘর পাতলে কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল, মার কাছে ছুটেছে।

....আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা; একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারেনা। কিন্তু বাপ-মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল, তখন নতুন খেলুড়ে হল। পুরানো খেলুড়েদের একরকম একেবারে ভুলে গেল। জাত—অভিমান নাই, আর শুচি-অশুচি নাই। আবার লোক লজ্জা নাই।" (শ্রী.রা.ক ১।১৫।২)

"খেলিছ এ-বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু, আনমনে...." (রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীনিগমানন্দের শিশুপ্রীতির প্রথম পরিচয় পাই আমরা ১৯১৫ সালে শ্রীরাজচন্দ্র ধরের (পরে স্বামী স্বরূপানন্দজী) বাড়ীতে। তিনি সেই প্রথম এসেছেন ডাক্তার ধরের ওখানে। বড়ছেলে নরেন্দ্র নাথ (স্বামী নির্বাণানন্দজী) ছাড়া ছোটদের প্রথম দিন দেখেন নি। দ্বিতীয় দিন সকালে যাচ্ছেন প্রাতঃকৃত্যের উদ্দেশ্যে - চোখে পড়ল বারান্দায় বসে তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে কি দিয়ে যেন ভাত খাচ্ছে এক থালায়। একটির বয়স আট-নয়, অন্যটি চার-পাঁচ বছরের। সব ছোটটি একেবারে নাড়ুগোপাল। তিনি অমনি দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে। এগিয়ে এসে বারান্দার উপর এক পা তুলে সকৌতুকে আলাপ শুরু করলেন নিতান্ত আপন জনের মত। "কি খাচ্ছ গো?" মহামান্য অতিথিকে তিনজনই গতকাল আড়াল হতে লুকিয়ে

দেখেছে। শুনেছে উনি ঠাকুর, ভগবান। তিন ভাইবোন আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে-লজ্জায়। তবে সবার ছোট যে, তার বোধ হয় ভয়টাই বেশী। সে আড়চোখে আগন্তুককে দেখেই ভাতের থালাটা কোলের কাছে আরেকটু টেনে নেয়—ভাগ চাইবে নাকি, ভাবটা এই রকম। বড়বোন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে—ছি! ছি! ঠাকুর কি ভাবলেন! সকালবেলাই খেতে বসেছি রাক্ষসের মত! মনে রাখতে হবে সেকালে ন'দশ বছরে মেয়েদের বিবাহ হত। সুতরাং নয় বছরের শৈলবালার এ লজ্জা স্বাভাবিক!

বাকী আছে পাঁচ বছরের বালিকা সুরবালা। ভাবছে ঠাকুরের প্রশ্নটার উত্তর দিদি দেয় না কেন? উত্তর না দেওয়া যে অভদ্রতা সেটা বোধের বয়স হয়েছে। তাই লজ্জানতমুখী বড়দির সাড়া না পেয়ে তাড়াতাড়ি নিজেই উত্তর দেয়, 'বাত'। পূর্ববঙ্গে চতুর্থবর্ণের উচ্চারণ প্রায় নাই। সুতরাং কি খাচ্ছ? তার উত্তর হল 'বাত', অর্থাৎ 'ভাত'! শুনেই হাসি পায় শ্রীনিগমানন্দের—কি মজার উচ্চারণ বাঙ্গাল দেশে। আবার জানতে চান, 'কি দিয়ে খাচ্ছ'?—উত্তর—'হুকতা' অর্থাৎ সুকতা (তিতো ঝোল)। বাঙ্গাল শালাকে' বলে 'হালা' নিগমানন্দ জানেন। কাজেই জিনিষটা কি তা বুঝে, এবং ছোটটির থালা টেনে নিয়ে সশংক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চাওয়ার অর্থ বুঝে আরও একটু মজা করার জন্য বলেন, 'আমাকে দেবে একটু?' তৎক্ষণাৎ ছোট খোকা ধীরেন (পরে ব্রহ্মচারী নৃসিংহ চৈতন্য) বড় বড় গ্রাসে দু'চার বার খেয়ে নেয়। সুরবালা বলল 'না'। 'কেন, আমায় দেবে না কেন'?—ঝুঁকে পড়ে আবারও প্রশ্ন করেন তিনি! সুরবালা লজ্জিত মুখে বলে 'আঁইঠা যে'। অর্থাৎ এ-যে আমাদের এঁটো (উচ্ছিষ্ট) তাই দেব না। 'ও, তাই দেবে না? তা নইলে দিতে?' সুধীরে ঘাড় নাড়ে সুরবালা। খুশী মুখে তার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি শৌচাগারের দিকে চলে যান।

শ্রীনিগমানন্দের গলার আওয়াজ পেয়ে ততক্ষণে বড়রা দু'চার জন

অদূরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সভয়ে ভাবছিলেন, না জানি কি অন্যায় কথা বলে বা অন্যায় করে বাচ্চারা। কিন্তু শ্রীনিগমানন্দের প্রসন্ন স্মিত মুখের আলাপ শুনে তাঁদের বুঝতে বাকী থাকে না শিশুর সাহচর্য তাঁর সহজেই ভাল লাগে, তাই এই অযাচিত আত্মীয়তা।

সে আত্মীয়তা বোধ যে কত গভীর, কিছুদিন পরে ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তিন ভাইবোনও তা নিঃসংশয়ে অনুভব করলেন। শৈশব স্মৃতি মন্থন করে সুরবালা দেবী বলেন, "পূজার ছুটিতে বাবা-মা-মামারা সবাই মিলে আশ্রমে গেছি। খুব উৎসব চলেছে, লোকে ভরা চারিদিক, আমরা তিন ভাইবোনও বাড়ির বাগানে গিয়ে খেলা করছি এক জায়গায় বসে। এমন সময় শুনি খড়মের শব্দ—সে শব্দ অতি পরিচিত হয়ে গেছে কয়দিনে। ঠাকুর আসছেন! কি বিপদ, এ দিকে আসছেন যে! ততক্ষণে ঠাকুর এসে পড়েছেন তাঁদের কাছে। এসেই কথা নাই, বার্ত্তা নাই একেবারে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনজনকে, 'তোরা এখানে? আমি তখন থেকে তোদের কত খুঁজছি।' মনে এলেও তিনজনের একজনও সম্ভ্রম বশে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি কেন খুঁজছিলেন ঠাকুর? আমাদের আপনার কি দরকার। কিন্তু সেদিনের সেই স্নেহব্যাকুল প্রশ্ন ও জড়িয়ে ধরা স্মরণ করে সুরবালা বলেছেন "ঠাকুরের ভাব দেখে মনে হয়েছিল, কতকালের হারানিধি কুড়িয়ে পেলে মানুষ যেমন আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে—আমাদের খুঁজে বার করে তাঁর যেন ঠিক সেই রকমই উল্লাস দেখেছিলাম।"

সত্যই তো! কিসের এত খোঁজাখুঁজি? খুঁজে পেয়ে এত আনন্দই বা কেন? নিজে একটি বিরাট শিশু বলেই কি অনেকক্ষণ বড়দের ভাবভক্তি দেখতে দেখতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল শ্রীনিগমানন্দের ইচ্ছা করছিল ছোটদের নিয়ে একটু প্রাণ খুলে হাসি গল্প করতে?

ধারণাটা যে নেহাৎ মিথ্যা নয়, আসাম মঠের দৈনন্দিন বিবরণ পড়ে তা বোঝা যায়—

"সে সময় মঠে বিকাল বেলায় ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটা আসর বসাতেন শ্রীনিগমানন্দ। সেখানে তিনিও ওই 'শিশু ভোলা-নাথ'দের একজন। তাঁর নির্দ্দেশে বাচ্চারা প্রাণ খুলে নাচত গাইত গল্প বলত হাসত খেলত; তাদের মাঝখানে বসে তুড়ি দিয়ে তিনি গান গাইছেন এ-দৃশ্যও বিরল ছিল না। একটা গান বেঁধেছিলেন নিজে - শুনেছি ওই শিশু-মঙ্গল আসরের প্রিয় গান সেটি—

'হরি বলে আমার বিমু নাচে।
নাচে রে নরসিং আমার, সঙ্গে ঈশ্বরচন্দে।
মুতে মুতে ঘর ভিজায় মরি তাহার গন্ধে॥'

তাঁর মুখে এ গান শুনে হা-হা হি-হি হু-হু করে হেসে গড়াগড়ি দিত ছোটরা। যাদের নাম নিয়ে গান তাদেরও পেটে খিল ধরে যেত হাসতে হাসতে এবং হাসির চোটে কারও উপরি উক্ত অকর্মটি করে ফেলে ঘর ভেজানও অসম্ভব থাকত না এক-একদিন।

ছেলে মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে দুরন্ত ছিলেন ওই 'বিমু' বা বিমলা মা। নিত্যই কোন-না-কোন অকর্ম করা তাঁর অভ্যাস ছিল। অথচ এই প্রাণ চঞ্চলা 'দুষ্টু' মেয়েটিকে তিনি যে কত ভালবাসতেন তার একটা প্রমাণ মিলবে নীচের ঘটনাটিতে। অন্যান্য গল্পের মত এটিও বিমলা মায়ের নিজের মুখেই আমাদের শোনা।

চুরি করে খাওয়া বিমুর একটি কীর্তি। খাটে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন শ্রীনিগমানন্দ খাটের তলায় সাজান রয়েছে শ্রীহট্টের বিখ্যাত সুমিষ্ট কমলালেবু (সিলেট কমলা)। পাছে ছোটরা চুরি করে এই আশংকাতেই ভৈরবী মা শ্রীনিগমানন্দের শয়ন ঘরে তাঁরই খাটের নীচে লেবুগুলি রেখেছিলেন। তাঁর ভয়ে নিশ্চয়ই ও ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না। কিন্তু বিমু সেখান থেকেও একটা নয়, ৪।৫টা লেবু চুরি করে খেয়েছিল—তাঁর ঘুমের সুযোগে। এই বিমু একদিন তাঁর রাত্রি ভোগের জন্য সংরক্ষিত এক বাটি তরকারি চুরি করে ধরা পড়ে গেল। একে তো শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ নিকেতনে

সৎ শিক্ষা পাওয়াই বড় কথা—চুরি মহাপাপ। তার উপর ঠাকুর ভোগের জিনিষ চুরি করে খাওয়া! আর ধরা পড়বি তো পড়, নিজের মায়ের কাছেই (করুণা মা) 'বিপ' ধরা পড়ে গেল। করুণা মা মেয়ের চুলের মুঠি ধরে একটা মোটা গাছের ডাল দিয়ে নির্মমের মত মারতে শুরু করলেন মেয়েকে। মেয়ে যত আর্তনাদ করে কাঁদছে 'ও মা, আর করব না গো। আর মের না!' ততই চামুণ্ডা মূর্তিতে মারছেন তিনি। মুখে বলছেন, "তুই মর! তোর মরাই ভাল। এত বড় 'নোলা' (রসনার লোভ) তোমার? তুমি ঠাকুরের ভোগের জিনিষ চুরি করে খাও! জিব টেনে ছিঁড়ে দেব আজ।" 'বিমু' মারের চোটে অর্দ্ধমৃত। তার করুণ চিৎকারে মঠবাসীরা অনেকেই কাতর হ'য়ে অনুনয় করছেন, আর মেরনা করুণা মা। ছেলে মানুষ না বুঝে দোষ করেছে একটা....।' কারও কথা কানে যায় না করুণা মা'র। তিনি যেন মেরেই ফেলবেন মেয়েটাকে। তখন 'বিমু'র চির সহচরী সুর-মা (শ্রীসুরবালা দেবী) জল ভরা চোখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে স্বয়ং ঠাকুরের কাছে নালিশ করলেন, 'ও ঠাকুর! বিমলাকে মেরে ফেলবে করুণা মা। কি মার মারছে, বিমলা পড়ে গেছে মাটিতে........তবু মারছে....'। টেবিলে বসে লেখা পড়া করছিলেন ঠাকুর। চমকে মুখ তুলেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন তৎক্ষণাৎ। কোনমতে পায়ে খড়মটা গলাতেগলাতে বলেন, 'কই রে! কোথায়?' 'ঢেকি ঘরের সামনে', সুর-মা একথা বলতেই দ্রুত পায়ে এক রকম ছুটে বার হলেন তিনি। বাইরে আসতেই 'বিমু'র বুক ফাটা কান্না তাঁর কানে গেল। বিমলা মা সজল চোখে বলেছেন, 'সে মুর্ত্তি এখনও আমার চোখে ভাসে—তাড়াতাড়িতে কাপড়ের গ্রন্থি আলগা হয়ে গেছে, মুখখানা ঘামে ভেজা, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চোখ মুখ। দূর থেকে এক হাঁক দিলেন, 'করুণা? কেন মারছ ওকে?' 'মারবনা, চুরি করে খায় মুখপুড়ী....' বলে করুণা মা আবার হাতের লাঠি তুলতেই কোমরের কাপড় শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে গর্জ্জে

উঠলেন তিনি, 'তুমি মারবার কে? চুরি করেছে কি না করেছে সে আমি বুঝব।' করুণা মায়ের হাতের লাঠি একটানে দূরে ফেলে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়া আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আবার ধমকে ওঠেন, 'বিমলা কি তোমার? ও আমার। ওকে শাসন করতে হয় আমি করব। তুমি কর কোন অধিকারে?' 'আমি তখন থর থর করে, কাঁপছি, দাঁড়াবার শক্তি নাই। তবু মনে আছে তাঁর সেই কথাগুলি' —'ও কি তোমার? ও আমার।'

প্রহার পীড়িতা বালিকাকে অদূরবর্ত্তী সুর-মার হাতে সঁপে দিয়ে আরেক বার রোষ-কষায়িত চোখে করুণা মায়ের দিকে চেয়ে পিছন ফিরলেন শ্রীনিগমানন্দ।

স্বরূপানন্দজী যোরহাট ছিলেন সে সময়। তিনি তখন মঠের ম্যানেজার। সন্ধ্যায় ফিরে ঘটনা শুনলেন, সেই সঙ্গে এও শুনলেন যে তারপর হতে সারাদিন ঠাকুর বড়ই বিমর্ষ হয়ে আছেন। স্বরূপানন্দজী নিত্য কর্ম সেরে প্রণাম করে তাঁর কাছে দাঁড়াতেই তিনি গম্ভীর আক্ষেপে বললেন, "সব শুনেছ তো? করুণার ব্যবহারে মনে আজ ভারি আঘাত পেয়েছি। ওর এত রাগের কারণ কি আমি বুঝিনি! বিমলা প্রায়ই চুরি করে, অবাধ্যতা করে বলে আমি যে ওকে মারি—ওর মায়ের সেটা গায়ে লেগেছে। তাই নিজেই ধরে জন্মের শোধ মারতে আরম্ভ করেছিল। এতো বিমলার উপর রাগ নয়, আমাকেই রাগ দেখানো। আমি কি কিছু বুঝিনা ভেবেছ! এভাবে 'বিমু'কে মারা কি ওর উচিত?"

আমরা বলি নিশ্চয়ই উচিত নয়। কবি বলেছেন—'শাসন করা তারেই সাজে, সোহাগ করে যে গো।' বিমলার ইহ-পরকালের ভার যাঁর উপরে, বিমলা বাঁচবে কি মরবে সে দায়ও তাঁকেই দেওয়ার কথা। করুণা মা বিমলার ক'দিনের আত্মীয়া? এক জন্মের বই তো নয়?

ঠিক ছোটছেলের মতই শ্রীনিগমানন্দ যত আনন্দ করতেন ছোটদের নিয়ে, কোন দোষ দেখে রেগে আবার ঠিক ততখানিই মারতেন।

মেরে ধরে তারপর ঘরে খিল দিয়ে কাঁদতেন। স্বরূপানন্দজীর ডায়েরীতে এমনি একটি ঘটনার কথা আছে।

একদিন কি একটা দোষ করায় বালক ব্রহ্মচারী নরসিংকে তিনি হাতে বেত্রাঘাত করেছিলেন। ছেলেটিও তেমনি—ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়ছে যন্ত্রনায়। কিন্তু সে হাত টেনে নিয়ে পালায়নি বা চিৎকার করেনি। তার সহ্য শক্তি দেখে বেত ফেলে দিয়ে সোজা গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে কোনও দরকারে যোগমায়াদেবী তাঁর খোঁজে এসে দরজা বন্ধ দেখে ধাক্কা দিয়ে দেখেন ভিতর থেকে খিল বন্ধ। এ আবার কি? মঠের মা সভয়ে মৃদু স্বরে ডাকেন—'ঠাকুর, ও ঠাকুব!' সাড়া নাই। তখন ভৈববী মা ঘুরে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। ঠাকুরের ভাব-ভঙ্গি তিনি কিছু কিছু জানতেন। অসময়ে দরজায় খিল দেওয়া ভাল কথা নয় তো! জানালায় গিয়ে দেখেন বিছানায পড়ে তিনি ছেলেমানুষেব মত কাঁদছেন। নীরবে সরে গেলেন যোগমায়া-দেবী। এখন সাড়া শব্দ দিলে 'হিতে বিপরীত' হতে পারে।

সন্ধ্যার সময় নরসিং-এর ডাক পড়ল শ্রীনিগমানন্দের কাছে। 'দেখি তোর হাত' বলতেই হাতের পাতা সে মেলে ধরে। কচি হাত বেতের দাগে লাল হয়ে কেটে কেটে গেছে, ফুলে আছে হাতটা। মৌন অভিমানে বালকের চোখ দিয়ে ধারা গড়াচ্ছে দেখে তাঁর চোখও ভিজে উঠল। ধরা গলায় বললেন "বড় লেগেছে না রে? কেন কথা শুনিস্ না, অবাধ্যতা করিস্?" নরসিংকে ভৈরবী মা আগেই বলেছেন, "তোকে মেরে ঠাকুর দরজা দিয়ে কাঁদছেন। মনে দুঃখ করিস না বাবা, উনি ওই রকমই।" সেটা নরসিং বেশ জানে। একবার যে ভৈরবী মাকেই তিনি লেপ-কম্বল চাপা দিয়ে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিলেন সে ঘটনা মঠে না জানে কে?

সুতরাং শ্রীনিগমানন্দের চোখে জল দেখেই বালকদের অভিমান চলে যায়। চোখ মুছে সে উল্টে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়, 'না ঠাকুর বেশি

লাগেনি! আচার্য্য এর চেয়েও বেশী মারেন এক একদিন।' আচার্য্য অর্থে শুদ্ধানন্দজী। তিনিও ভারী কোপন স্বভাব ছিলেন। ছেলেদের মারবার সময় তাঁর কাণ্ড-জ্ঞান থাকত না একেক দিন, ঠাকুর জানেন। কিন্তু বালকের কথায় সায় দিলে বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি তার মন বিরূপ হবে। তাই মুখে সে বিষয়ে আর কিছু না বলে বললেন, "আমার কথা যদি শুনিস্ কোন দিন মারব না তোকে। শুনবি তো?" নরসিং ব্রহ্মচারী ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেন। আদেশ অমান্য করা তারপরেও দু'চারবার হয়ে গেছে। কিন্তু প্রহার আর খেতে হয়নি। মঠের ছেলেমেয়েদের মারা সম্বন্ধে শ্রীনিগমানন্দের অভিমতটি নূতন ধরনের—

"শুধু-বিমু কেন, নরসিং, সুর, এদের আমি নিজে গড়ে পিটে মানুষ করেছি। একেকজন কি কম মার খেয়েছে আমার কাছে? তাই, ওদের আমি যেমন ভালবাসি নতুনদের তেমন পারি না। যাকে ধরে মারতে পারি, জানবি তাকেই আমি বড় ভালবাসি। ভালবাসার জনকে মেরে কেটে খুন করে ফেলতে পারি দরকার হলে—এমন জোর যদি থাকে তবে না খাঁটি ভালবাসা।" (নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ)

আরেক দিন ছোটদের নিয়ে 'আমি চাষা হব' বলে বাগানে গাছ লাগাতে গিয়ে কাঁদাজল খেয়ে ভূত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরে এসে হাঁপানের কথাও স্বরূপানন্দজীর দিন লিপিতে আছে। সেবকেরা ঘাম মুছিয়ে বাতাস করে অনেক চেষ্টায় তাঁর শ্রম দূর করেন। মঠে ঠাকুরের এই নিত্য-নূতন ছেলেমানুষী দেখেই স্বভাব সংযত, স্বল্পবাক্ বরদাব্রহ্মচারী (শ্রীমৎ নির্বাণানন্দ সরস্বতী) তাঁর 'নিগমস্তোত্রে' ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপকে বলেছেন 'অর্ভকবৎ তু চেষ্টিতম্' কচি খোকার মত যত কাণ্ড।

১৩১৯ হতে ১৩২৯ সাল—পুরা ১১ বৎসর মঠই ছিল শ্রীনিগমানন্দের ঘরবাড়ী, ছেলেমেয়েরা তাঁরই ছেলেমেয়ে। প্রথম যুগে সবচেয়ে

ছোট ছিলেন নরসিং আর সুর (স্বরূপানন্দজীর ছোট ছেলে মেয়ে)। তিনি নিজের হাতে নরসিংকে রাধা আর সুরকে কৃষ্ণ সাজাতেন। কারণ ছেলেটি ফর্সা ছিল এবং মেয়েটি কালো। সাজিয়ে বলতেন, 'তোরা নাচ, আমি গান করি।' নৌকায় বেড়াতে গিয়ে যোগানন্দ প্রমুখ অন্তেবাসীরা যখন সমবেত কণ্ঠে ভজন গাইতেন, শ্রীনিগমানন্দের সামনে ওদের দুজনকে ঘুরে ঘুরে নাচতে হত, যেন ছোট দুটি গৌর নিতাই। ছোটদের নিয়ে বাগানে কাজ করা, মাঝে মাঝে 'চড়াই ভাতি' (বন-ভোজন) উৎসবে কাছে বসিয়ে খাওয়ানো, সন্ধ্যায় ওদের দিয়ে গান গাওয়ানো চলত। আবার নিজেই তাদের অক্ষর পরিচয় করিয়ে প্রতিদিন পড়ানো, মুখে মুখে ব্রহ্মচর্য্যের পাঠ দেওয়া সৎশিক্ষা ও আচার নিয়ম শেখানো এও ছিল। প্রথম আমলের এই সব ছেলেমেয়েরাই উত্তর কালে মঠের নাম করা কর্মী ও সেবিকার অধিকার পেয়েছিলেন।

ক্রমে শিশু বিভাগ বাড়ল। তখন শিক্ষার ভার ঋষি বিদ্যালয়ের আচার্যকে দিয়ে তিনি ওদের নিয়ে হাসি গল্প করতেন। বাইরে যাওয়ার সময় জনে জনে জিজ্ঞাসা করতেন 'কি আনব কার জন্যে?' ফল মিষ্টি বাইরে যা পেতেন আসার সময় তারই উদ্বৃত্ত অংশ ছোটদের জন্য এনে নিজের হাতে তাদের দিতেন। একবার একটি ছেলে বলেছিল 'ঠাকুর আমাদের একটা গ্রামোফোন চাই।' 'দেখা যাক্' বলে ঠাকুর বিদায় নিলেন। তিনি কখনও কারও কাছে এ ধরনের জিনিষ চাইতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, সেবার একজন ধনী শিষ্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে একটি গ্রামোফোন ও কয়েকটা রেকর্ড দিতে চাইল। মঠের ছেলেটি অদ্ভুত আবদারটা না করলে ও জিনিষ তিনি মঠে আনতেন না। কিন্তু শিষ্যটি অযাচিত ভাবে জিনিষটা দিতে চাওয়ায় তাঁর মনে হল এটি জগন্মাতারদান। ছেলেটির দাবী তাহলে মাহেশ্বরীর অনভিপ্রেত নয় বুঝে তিনি শিষ্যটির দান গ্রহণ করলেন।

তারপর আর কি? কি খুশীরহাট মঠে। শ্রীনিগমানন্দ ছোটদের

চারিদিকে নিয়ে মাঝখানে বসে নিজের হাতে গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনালেন। ছেলেমেয়েদের স্ফুর্ত্তি দেখে কে? তাদের কঠোর নিয়মে বাঁধা মঠ জীবনের যা কিছু আনন্দের সুর, তাই তাঁর কৃপাতেই তাদের প্রাণে বাজত।

মঠ পর্বের পরই উল্লেখযোগ্য সাবজজ্ ৺অশ্বিনী কুমার দাশগুপ্তের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনাবিল সখ্য। ৺অশ্বিনীবাবুর বড় মেয়ে 'ফেলি' (হেমলতা), মেজমেয়ে 'ননী' (স্নেহলতা) সেজ 'মাখন' (শান্তিলতা) ও ছোট 'ছানা' (আশালতা) সকলেই ঠাকুরের বান্ধবী। 'ছানা'র পরে 'কানু' মেজছেলে। সকলের ছোট ছিল 'রেণু'। বড় ছেলে 'লালু' ভারী লাজুক ছিল। কিন্তু 'কানু' ও 'রেণু'র সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সর্বকনিষ্ঠ 'রেণু'কে ভাই-বোনেরা আদর করে ডাকে 'দাদু'। পশ্চিমবঙ্গে যেমন 'দাদামনি', পূর্ববঙ্গে তেমনি দাদু'। সকলের ছোটকে বড়র মত মান দেওয়া পরম সমাদরে—এই মনোভাব হতেই ওই সব ডাকের উদ্ভব। বাচ্চা ছেলে মেয়ে আজ-কাল বলে নয়, বহুকাল আগে হতেই 'বাবু' 'বাবুআ' 'বাবুসোনা' অভিধা পায় ওই একই মনোভাবের ফলে।

যাই হোক, রেণুকে তিনি ডাকতেন 'দাদু', আর সে ডাকত 'লালথাতুল' কেউ তাকে ওডাক শেখায়নি। কে জানে শ্রীনিগমানন্দের কি রূপ সে দেখেছিল যে বাল্যকালেই ওই নামটি স্ফুরণ হয়েছিল তার মুখে! 'লাল' বিশেষনটা সুন্দর বা মনোহর বস্তুতেই লাগে। শিশুর চোখে 'থাতুল' কে লাল বোধ হয়েছিল কেন কেউ তা জানে না। কিন্তু 'লাল ঠাকুর' নামটি ভারী মিষ্টি। অশ্বিনীবাবুর ঘরে বন্ধু বন্ধু খেলা কেমন জমেছিল তার বিবরণ নীলাচলে 'ঠাকুর নিগমানন্দ' ১ম খণ্ডে আছে।

তিনি যখন যেখানে যেতেন ছোট ছেলেদের সঙ্গে তাঁর একটুতেই ভাব জমে যেত। একটি কৌতুকপ্রদ এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাপ্রদ গল্প উপহার দিয়েছেন শ্রীতারক হালদার। তাঁরই

বাল্যকালের কাহিনী। সতীশ হালদার ছিলেন ঠাকুরের মন্ত্র শিষ্য। তিনি সাধারণ মানুষ নন। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'—নামধেয় বিখ্যাত বই খানায় প্রথম বাঙ্গালী রূপে চিহ্নিত ও কীর্ত্তিমান পুরুষ তিনি। 'মহাপুরুষ' নাটক 'মহাসাধক নিগমানন্দ' পুস্তকের -লেখক তারক হালদার তাঁরই সন্তান। ঘটনাটি শ্রদ্ধেয় সতীশ হালদারের কাহিনী প্রকাশ কালে দেওয়া যাবে।

এছাড়া ছোট ছোট মজার ঘটনা কতই আছে। তার স্থান কাল পাত্র আজ আর চিহ্নিত করা যাবে না। কিন্তু মুখে মুখে গল্পগুলি চলে আসছে। শ্রীনিগমানন্দ কোন এক শিষ্যের বাড়ি গেছেন। বাড়ীর ছেলেটির সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে আমাদের শিশু ভোলানাথের। তার অভিভাবকেরা সেবার আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁর পার্শ্বচর সেবকরাও বড় ধারে কাছে নাই দেখে ছেলেটি এসে ধরেছে 'এস ঠাকুর আমার সঙ্গে খেলবে।' তিনি বললেন, 'কি খেলব বল'। সে বলল 'ঘোড়-ঘোড়া। আমি ঘোড়া হই, তুমি বস আমার পিঠে।' ছেলেটি যে নিতান্ত কচি ছিল তা এই অসম্ভব প্রস্তাবেই বোঝা যায়। ঠাকুর মহারাজের বিরাট কলেবর সে বহন করতে পারবে কিনা এ হিসাব তার নাই। ঠাকুর রাজী হয়ে বললেন, "আচ্ছা, তবে তুই ঘোড়া হ"। বলে তিনি উঠে দাঁড়াতেই ছেলেটি মাটিতে উপুড় হয়ে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে ঘোড়া হল। ঠাকুর এসে তার পিঠে বসলেন; অর্থাৎ বসার ভঙ্গি করলেন। 'বল হ্যাট্ হ্যাট্' খোকা শিখিয়ে দেয়! অশ্বারোহী হ্যাট্ হ্যাট্ বলতেই সে ঠাকুরকে নিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করে। ঠাকুরও আধবসা ভঙ্গিতে চলেছেন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ও ভাবছে আমি ঠাকুরকে বয়ে নিয়ে চলেছি। অতবড় ঠাকুরকে এমন স্বচ্ছন্দে পিঠে নিয়ে তার আত্মসম্মান স্ফীত হয় আরও। এক পাক ঘুরে এসে প্রস্তাব করে "এবার ওঠ তুমি। এখন তুমি ঘোড়া হবে, আমি তোমার পিঠে চড়ব।" খুব ন্যায় সঙ্গত কথা। খেলার বিধানে এই রকমই আছে যে পরস্পরকে কাঁধে নিতে

হবে। একজনই কি ঘোড়া হবে বরাবর? তা হয় না। তিনি সোজাসুজি না বলতে পারেন না। তাই কৌশলে নিরস্ত করার জন্য বলেন, 'তোর বাবা-মা কি আর কেউ যদি দেখে তুই আমার পিঠে বসেছিস, তাহলে মারবে কিন্তু।' 'কেউ নাই কোথাও' আবদার করেন খোকাবাবু—'তুমি হও না ঘোড়া! আমি তোমার পিঠে চড়ব।' অগত্যা আর কি করা। তিনি বললেন 'একবার ছুটে গিয়ে তবে দেখে আয়—কে কোনখানে আছে।' 'আচ্ছা', ছুটে চলে যায় খোকা। চারিদিকে দেখে এসে খুশী মুখে বলে, 'না, সবাই কাজে ব্যস্ত ঠাকুর। তুমি তামাক খাচ্ছ যে! এস তাড়াতাড়ি।' হুঁকার নল রেখে তার খেলার সাথী হয়ে মাটিতে উপুড় হতে হল শ্রীনিগমানন্দকে। সে ছেলে পরমানন্দে তাঁর পিঠে লাফিয়ে উঠে বসে হাঁকে, হ্যাট্ ঘোড়া হ্যাট্ চল্ শিগগির।' ঘোড়া সুবাধ্য বাহনের মত বেশ চলছে, এমন সময় হঠাৎ এসে পড়ে খোকার অভিভাবকবৃন্দের কেউ একজন। 'এ কি! কি সর্বনাশ! খোকা, হারামজাদা ছেলে—'। ছেলে ততক্ষণে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালিয়েছে। শ্রীনিগমানন্দ অপ্রস্তুত মুখে উঠে পড়ে বলেন, "আহা! মের না ওকে। ওর কি দোষ! আমি ওকে ঘোড়া হতে বলায় ও আমায় পিঠে করেছিল। কাজেই ও আমায় ঘোড়া হতে বললে ওর দোষ কি?" ছেলের অভিভাবক হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে ঠিক করতে না পেরে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থাকেন। তারপর সসংকোচে বলেন, 'ওর অপরাধ হবে না ঠাকুর? আপনার গায়ে পা লাগল, তার উপর পিঠে চড়া........।' শ্রীনিগমানন্দ চেয়ারে বসে তামাক খেতে খেতে স্মিত মুখে বললেন, "শিশু নারায়ণ! ওদের আবার অপরাধ কি"?

ঠিক এই কথাই বগুড়ার সুরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্তকেও তিনি বলেছিলেন। তিনি তাঁদের বাড়িতে অতিথি তখন। চেয়ারে বসে আছেন পায়ের কাছে চৌকি। দুই ছোট ছেলেকে এনে সুরেনদা তাঁকে প্রণাম করতে বলেন। ওরা প্রণাম করে চৌকির উপর

ওঠার চেষ্টা করে। ঘরে আরও সব ভক্ত আছেন—তাই বাচ্চা দুটিকে ওখানেই রেখে সুরেনদা কোনও কাজে বাইরে গেলেন। শ্রীনিগমানন্দের উপদেশ শুনছেন জিজ্ঞাসুরা, দুই বাচ্চা ওদিকে চৌকি বেয়ে উপরে উঠেছে। উঠে বাঁদরের মত ঠাকুরের দুই পা ধরে গাছে চড়ার চেষ্টায় ব্যস্ত। হঠাৎ একজন শিষ্যের ব্যাপারটা চোখে পড়তেই তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—'আরে, ঠাকুরের গায়ে ওদের পা লাগছে।' বাধা দিয়ে তিনি পরম স্নেহে বললেন, 'ওরা যে গোপাল। ওদের পা গায়ে লাগলে কি হয়। থাক না বেশ মজা পেয়েছে ওরা।' সুরেনদাও এসে সব দেখে শুনে যত লজ্জা পান, তত আনন্দও হয়। কি ভালবাসা তাঁর প্রেমের ঠাকুরের! বড় হয়ে ছেলেরা তাদের বাবা মায়ের কাছে এ গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়।

তাঁর আরেক দল বন্ধু বান্ধবী ছিল ভুবনদার পূর্বাশ্রমের বাড়ি, পাবনা জেলার দীঘলকান্দিতে। সে বাড়ীর ছোট ছোট মেয়ে বুঁড়ি, শোভা, বিভা রাণী, মালতী, সুরধনীরা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের 'সই' অথবা 'বান্ধবী'। রীতিমত শাড়ী ও রুমাল বিনিময় করে সই পাতানো হয়েছিল। তারা ঠাকুরকে দিল শাড়ী, তিনি দিলেন এক খানা করে রুমাল। একটুও তাঁকে ভয় করত না মেয়েরা। সাত বছরের রাণী কৃষ্ণযাত্রা দেখে এসে একদিন ঠাকুরের সামনে হাত নেড়ে গান ধরে দিল, 'নারী না হলে ঠাকুরের ঘুম ধরে না।' বালিকার কেমন স্পষ্ট বোধ জন্মেছে শ্রীকৃষ্ণ যা, আমাদের ঠাকুরও তাই। সুতরাং তাঁকে যা বলছে গোপীরা, এঁকে তা বলতে পারি। এই হল সহজ ভাব। হাসি পায় শ্রীশ্রীঠাকুরের। মুচকি হেসে মৃদুস্বরে বলেন 'সেরেছে রে।' আশেপাশে অন্তেবাসী ব্রহ্মচারীরা রয়েছে। এ মেয়ে মঠাধীশ্বরকে একেবারে মাটি করে দিল তাদের সামনে—তাঁর ভঙ্গিটা এই রকম। সকৌতুকে হাসেন সেবকরা। মঠে এই রঙ্গপরায়ণ সহজ মানুষটিকে তাঁরা বেশি দেখতে পান না।

দীঘলকান্দির বাড়িতে মেয়েরা যেমন 'সই' ছেলেরা তেমনি 'বন্ধু'।

তাদের কেউ বা কাগজের টুপি তৈরী করে এনে ঠাকুরকে বলে 'পর'। ঠাকুর সেই টুপি মাথায় দিয়েই ভোগের ঘরে গিয়ে বসেন। কেউ বা নদীতে নৌকা বাইচ (Boat race) খেলার সময় তাঁর নৌকা পিছিয়ে পড়লে বলে ওঠে, 'ঠাকুরটা কোন কাজের নয়, কেবল গল্প করে।' ছোট ছেলে মেয়েরা ঠিক চিনে নিত দেখতে যতই বড় সড় হ'ক না কেন শ্রীনিগমানন্দ আসলে তাদেরই সমবয়সী।

নীলাচল কুটীরে সেবার নৃপেনদার বড় ভাই অনুকূল চন্দ্র রায়েরা সদলবলে গেছেন। দীক্ষাপর্ব ছিল বোধ হয়—ভোগ হতে অনেক দেরী হয়েছে। বেলা প্রায় দেড়টার সময় ভোগের ঘর হতে বেরিয়ে কুটীরের বারান্দায় বসে তিনি হাত মুখ ধুচ্ছেন—এমন সময় অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে গোলগাল কালো রং একটি বছর আড়াইয়ের খুকী সোজা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। তাঁর হাঁটুর কাছে দাঁড়িয়ে নিজের দুই হাঁটুতে হাত রেখে নুয়ে পড়ে চুপি চুপি খুকী জানতে চায় 'তুমি খাইলা আমাগো বাত কই ?' ঠাকুর তুমি তো ভূরি ভোজ সেরে এলে—আমাদের অন্ন কই—ক্ষুধায় যে প্রাণ যায়। শ্রীনিগমানন্দ তারই মত নীচু গলায় ফিস্ ফিস্ করে বললেন 'তোমাগো বাত আছে, এখনই পাবে।' বলেই হাঁক দিলেন 'হরেন ! বারান্দায় পাতা দে জল দে বেলা অনেক হল।' খুকী কাল চোখে প্রসন্ন মুখে তাঁর দিকে চেয়ে তুরতুর করে বাপ মার কাছে চলে গেল।

অগনিত খোকা-খুকুদের ফেলে রেখে খেলার হাট ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের বিরাট শিশুটি একদিন কোথায় আর কোন দেশে চলে গেলেন কি জানি ! শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা মতই তিনি সত্ত্বগুণেরও অধীন নন। একদা যাদের এত ভালবেসেছিলেন, এত হাসি কান্নার খেলা খেলেছিলেন—পিছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি আর কোন আলোর দেশের খোকা-খুকীদের পেয়ে মাটি ময়লা মাখা তাঁর এই পুরনো খেলার সাথীদের তিনি মনেও করেন না আর। আমরা কিন্তু আজও সেই আড়াই বছরের ছোট খুকীর মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ব্যগ্র প্রত্যাশায় প্রশ্ন করছি, ঠাকুর তুমি তো পরিতৃপ্ত হয়েছ আজ, কিন্তু আমাদের প্রসাদ দিলে কই ? আমরা যে এখনও অভুক্ত আর্ত, ঠাকুর !

'বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌'

ময়নামতী সারস্বত আশ্রমের পূতস্মৃতি ধারক, পূর্ববাংলা সারস্বত আশ্রমকে বিনম্র প্রণতি জানাই।

শ্রীনিগমানন্দের মুখে আমরা শুনেছি তৎপ্রতিষ্ঠিত সাতটি মঠাশ্রমের ভূমিই তাঁর সাতটি সাধক জীবনের সঙ্গে বিজড়িত। অন্যগুলির সঙ্গে কি সূত্রে যোগ ছিল তা তিনি কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে জানি না। কেবল জানি, আমাদের মা ঠাকুরাণীর জন্মভূমি ছিল হালি সহর আর জানি ময়নামতী আশ্রমের কথা।

সারস্বত সংঘের সকলেই জানেন ঠাকুর নিগমানন্দ পূর্বজন্মে ছিলেন শিব সাযুজ্যস্পর্ধী মহাকৌল ব্রহ্মানন্দ গিরি। ব্রহ্মানন্দ গিরির সাধন শৌর্য্যে বশীভূতা পরমেশ্বরী ময়নামতী পাহাড়েই পাটনী কন্যা রূপে তাঁর ঘরনী হয়ে দীর্ঘদিন তাঁর ঘর করেছিলেন; প্রাণপাতি সেবায় দিনের পর দিন তুষ্ট করেছিলেন গিরি মহারাজকে। ময়নামতী আশ্রম শ্রীনিগমানন্দেব সেই অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি মহিমার স্মারক ছিল।

বাণী ময়নামতী বাংলার গৌরব, বাঙ্গালী মেয়েদের নিত্য স্মরণীয়া মহাশক্তিময়ী সিদ্ধা যোগিনী। পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘবে এক সময় 'মীনচেতন' বা 'গোরাক্ষবিজয়' এবং ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের গান বহুল প্রচলিত ছিল। বাংলাব মেয়ে বানী ময়নামতী যশস্বিনী ও মহিমান্বিতা। তাঁর অতুলন জীবন-কাব্যের সংক্ষেপে উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক নয়।

'রানী ময়নামতীর মধ্যে ফুটে উঠেছিল ভারতীয় নারীর চিরন্তন চরিত্র। বিনা দোষে স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সাধ্বী পত্নীর মত তিনি কোন দিন স্বেচ্ছাচারী ভোগী স্বামীর অকল্যাণ কামনা করেন নি। মৃত্যুকালে রোগগ্রস্ত হয়ে স্বামী মানিকচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইতেই নিরভিমানী ময়নামতী ফিরে এসে স্বামী সেবায় রত হলেন। স্বীয় যোগশক্তিতে তিনি মানিকচন্দ্রকে রক্ষা করেছেন দেখে দেবী মহামায়া রাজা মানিকচন্দ্রকে দিয়েই

ময়নামতীকে স্বামীর শয্যা পার্শ্ব হতে সরাবার ব্যবস্থা করলেন। মুমূর্ষ রাজা ময়নামতীর হাতে গঙ্গাজল খেতে চাওয়ায়, অনিচ্ছায় রানীকে গঙ্গাকূলে যেতে হল। কিন্তু গঙ্গাস্নান করে জলঘট নিয়ে তীরে উঠেই ময়নামতী শুনলেন, স্বামীর প্রাণ বিয়োগ হয়েছে। সিক্তবসনা ময়নামতী তখন সেই গঙ্গাকূলেই যোগস্থা হয়ে স্বামীর অনুসরণে যমভবনে যাত্রা করলেন।'

অদ্ভুত সে কাহিনী, 'ময়নামতীর গান' গেয়ে বাংলার পল্লী কবিরা শত শত বৎসর ধরে বর্ণনা করেছেন এই বাঙ্গালী সাবিত্রীর কীর্ত্তিগাথা। সত্যবান-জায়ার মত করযোড়ে সবিনয়ে যমের পশ্চাদনুসরণ করেননি ময়নামতী। তিনি করালী-মূর্ত্তিতে ঝড়ের বেগে ছুটলেন। যোগবলে মূহূর্ত্ত মধ্যে লক্ষ কোটি যোজন পার হয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎ শিখার মত সংযমনী পুরী আক্রমণ করলেন তিনি, বামচরণে ঠেলে ফেললেন মৃত্যুধামের দুর্ধর্ষ কবাট। ঘোর হুহুংকারে আবির্ভূতা হলেন ধর্মরাজের সভায়, ছিনিয়ে নিতে চাইলেন চিত্রগুপ্তের অমোঘ বিধানের পাঁজী পুঁথি। 'যমে মানুষে লড়াই' প্রবাদটা কি ময়নামতীরই কীর্ত্তি-স্মারক? বাংলার পল্লীচারণ মহোল্লাসে গেয়ে গেছেন 'মার মার' রবে ময়নামতী যমকে তাড়া করলেন। দশদিকে দশমহাবিদ্যা দেখে সভয় চিত্তে মহেশ যেমন বলে উঠেছিলেন 'কোথা যাব, কোথায় পালাব'? মহাযোগিনী ময়নামতীর বিক্রমে ধর্মরাজ যমেরও তেমনি দশা। তাঁর 'অন্তর্ধার' বিদ্যা সর্বদর্শিনী ময়নামতীর সামনে খাটে না। ছদ্মবেশ খসে যায় মহাজ্ঞানশালিনীর প্রচণ্ড তাড়নায়। যে মৃত্যু জীবলোকের নিকট মহারহস্য, ময়নামতী তার সকল অন্ধি সন্ধির খবর রাখতেন, লোক-কাব্যের অতিশয়োক্তি ও নানা উপমা বাদ দিয়ে সারকথা এইটাই আমরা পাই যে, মরণ রহস্যের সকল কুঞ্চিকাই যোগিনী ময়নামতীর করামলকবৎ আয়ত্বাধীন। তাই শ্রদ্ধায় গৌরবে বুক ভরে উঠে, ভাবি এমন মেয়েও আমাদের দেশে কোনদিন ছিল তা হলে?

ছিল বলেই ময়নামতীর সাধনপীঠ ময়নামতী পাহাড়েই বুঝি মহামাহেশ্বরী মানবী হয়ে নেমে এসে ছিলেন, মন্ত্রনির্জ্জিতা ভুজঙ্গীর মত মাথা নীচু করে ধরা দিয়েছিলেন শৈবাগ্রগণ্য অমিততেজা ব্রহ্মানন্দগিরির কাছে। আমরা এবার সেই পার্বতীনাথকেই পেয়েছি সাক্ষাৎ সদাশিব-বিগ্রহ পরমহংস নিগমানন্দদেব রূপে। তাই প্রণাম করি ময়নামতী আশ্রমকে, প্রণাম করি পূর্ববাংলা সারস্বত আশ্রমাবস্থিত গুরুব্রহ্ম পীঠকে। নরাকার পরব্রহ্ম শ্রীনিগমানন্দের জন্মান্তরীন অমানুষী সাধন সম্পদের ঐতিহ্য বহন করছে ওই পীঠ।

ঠাকুর নিগমানন্দের মহাজীবন মধ্যাহ্ন ভাস্করের মতই দুর্নিরীক্ষ্য। এই সাধারণ দুটি চোখে কেউ কোন দিন তাঁর পূর্ণ মহিমা অবলোকন করতে সক্ষম হবে—সে আশাবৃথা। সূর্য্য-মণ্ডল দেখতে হইলে কালি মাখান কাচ ব্যবহার করতে হয়। তেমনি আদিত্য বর্ণ-মহাপুরুষকে, সদগুরু নিগমানন্দ দেবকে দর্শন করতে গিয়েও আমরা কোনও না কোন কৃত্রিম 'পরকলা' ব্যবহার করতে বাধ্য। এই 'পরকলা' হল নিজ মনের সংস্কারানুরূপ সামর্থ্য। অধিকারানুযায়ী কেউ ভক্তি-বিশ্বাসের দৃষ্টিতে, কেউ বা তত্ত্ব বিচারের মাধ্যমে, কেউ কেউ ভাবুকতা বা কবিত্ব সহায়ে শ্রীনিগমানন্দকে বুঝতে ও প্রকাশ করতে চাই। কিন্তু সবার দেখাই অসম্পূর্ণ। এভাবে তাঁর সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। শ্রীনিগমানন্দদেবকে সম্যক ধারণা করতে হলে আরেকটি নিগমানন্দ হওয়া চাই। শ্রীকৃষ্ণকে অখণ্ড স্বরূপে দর্শন করেছিলেন কেবল মাত্র বেদ বিভাগ কর্ত্তা গুরু ব্যাসদেব। শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্ত অর্জুন তাঁর ঐশ্বরীরূপ দেখেছিলেন তাঁরই প্রসাদে, তাঁর দেওয়া দিব্য চক্ষু দ্বারা। পরমহংস শ্রীনিগমানন্দ সদ্‌গুরু, অতএব পূর্ণব্রহ্মতত্ত্ব। তাঁকে অখণ্ড চিন্ময় স্বরূপ দর্শন করতেও ব্যাসদৃষ্টি বা নরঋষি পার্থের মত দৈবী সম্পদের অধিকার চাই।

শ্রীনিগমানন্দের নামটি পর্য্যন্ত তত্ত্বমালা বিভূষিত। 'নিগম' শব্দের অর্থ যে বেদবিদ্যা এ আমরা সবাই জানি। কিন্তু তন্ত্রে ওই 'নিগম'

সংজ্ঞার একটি বিশেষ অর্থ আছে। 'আগম' শিব বাক্য, সেখানে বক্তা মহাদেব, শ্রোত্রী দেবী শিবানী। কিন্তু 'নিগম' হল ঠিক বিপরীত। মাহেশ্বরীর নিকট হতে যে পরাবিদ্যা মহেশ্বর লাভ করেন, তাই হল 'নিগম' বা পরমাসিদ্ধি। তন্ত্র কথিত 'নিগমের' এই ব্যাখ্যার অসাধারণ ব্যঞ্জনা আছে

"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে" প্রসিদ্ধ সন্তবানী। ব্রহ্মই মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে জীব হয়। জীবকুল মধ্যে যিনি আধিকারিক পুরুষ বা লোক শিক্ষাদাতা সদ্‌গুরু রূপে পূর্ব হতেই নির্দ্দিষ্ট আছেন, ব্রহ্মশক্তি স্বয়ং তাঁর সাধন সহায় হয়ে তাঁকে ব্রহ্মজাল হতে মুক্ত করেন। শ্রীনিগমানন্দ এইটিকেই বলে গেছেন 'মায়ের কৃপা'। ব্রহ্ম বিদ্যা সম্প্রদানে অধিকারী বিচার চিরন্তন রীতি। সর্ব সাধারণ কোন দিন সে বিদ্যালাভের অধিকার পায় না, পেতে পারে না। তন্ত্রমতে 'নিগম' আবার সেই ব্রহ্ম বিদ্যার সার। গুহ্যাতিগুহ্য পরম তত্ত্ব। পরমেশ্বরী স্বয়ং যাঁকে নিজ ভর্তা বলে বরণ করেন, বিশ্ব জগতে সেই শিব ছাড়া অন্য কেউ সে বিদ্যালাভ করা দূরে থাক, শোনবারও অধিকারী নয়। 'সর্বশ্রুতি শিরোরত্ন' নিগম তাই শ্রীগুরুরই আয়ত্বাধীন। মহামহেশ্বরী তাঁকে ছাড়া আর কাউকে 'নিগম' আয়ত্ব করতে দেবেন কেন? তিনি দ্বার ছেড়ে দিলে তবে তো! 'মোক্ষদ্বার কপাট পাটনকরী' স্বয়ং ব্রহ্ম-বিদ্যাকেই এজন্য নিগমপ্রবক্ত্রা বলা হয়েছে. শ্রোতা নরাকার পরব্রহ্ম—'জন্মজন্মান্তরের সাধনায়' যিনি জীবত্ব হতে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

শিব যে জীব হন, সেটি অবতরণের ধারা। আর জীবের শিবত্ব লাভ হল উত্তরণের ধারা। গুরু এই উত্তরণ ধারার ধারক। নিজে জীব হয়ে জীবের দুঃখ বুঝে—তিনি সাধনসিদ্ধিসত্ত্বায় ভবরোগ বৈদ্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন। যে বিদ্যাসহায়ে তিনি "পিঞ্জরাদ্‌ ইব কেশরী" জগজ্জাল ছিন্ন ভিন্ন করে নির্গত হন তা-ই 'নিগম'—নির্গমনের কৌশল। এ কৌশল স্বয়ং গুরুশক্তি তাঁকে শিখিয়ে দেন। তাহলে

ঠাকুর নিগমানন্দদেবের নামটি যে তাঁর স্বরূপ পরিচয়, এতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? ওই নামেই নামীর সাধনা সিদ্ধি ও স্বরূপাবস্থিতির ইতিহাস সংগুপ্ত।

তাহলে আরেকটি কথাও এসে যায়। পরমেশ্বরী প্রথমাবধি এভাবে যাঁকে চিহ্নিত করে রেখেছেন, মূলে তিনি নিশ্চয়ই সদাশিব বা গুরুতত্ত্ব! জগৎচক্রে প্রবেশের পূর্বেই তিনি গুরুরূপে নির্দিষ্ট রয়েছেন। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি জন্মজন্মান্তরের সর্বশ্রেণীতেই তিনি বিশিষ্ট একজন। প্রথমাবধি কখনই তিনি ঠিক সাধারণ জীব নন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই রহস্যটি খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝানো আছে। ভগবান বুদ্ধই প্রথম ঐতিহাসিক পুরুষ, যিনি ঈশ্বরকে না দেখিয়ে সোজা বলছেন, বল "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" তার অর্থ, বুদ্ধদেব ঈশ্বর বাদী নন, গুরুবাদী। তিনিই বলেছিলেন, "পশু পক্ষী আদি কোন জন্মেই আমি সাধারণ কেউ ছিলাম না। আমার সত্তা চিহ্নিত।" এই চিহ্নিত সত্তাকে বৌদ্ধরা বলতেন 'বুদ্ধাঙ্কুর'। আমরা বলব, আমাদের ঠাকুরও তাহলে মূলে ছিলেন 'জ্ঞানাঙ্কুর' বা 'শিবাঙ্কুর'। তাঁর নিজের কথাতেই আমরা এর সূত্র পেয়েছি—"গুরু গুরুত্বের অধিকারী হয়েই জন্মান, তিনি গুরুরূপেই জন্মান, অর্থাৎ জন্মাবধিই তিনি গুরু। ব্যবহারিক হিসাবে লৌকিক ব্যবহারে তাঁকে শিষ্যত্ব স্বীকার করতে হলেও, তখনও অনেকস্থলে তাঁর গুরু-প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। গুরু ঐ জন্মসিদ্ধ গুরুর (বা তাঁর এই শিষ্যের) এমন সব বিশেষ বিশেষ প্রতিভা ও অমানুষিক শক্তির স্ফূরণ দেখেন যে গুরু হয়েও তাঁর স্তাবক হয়ে পড়েন।"

শ্রীনিগমানন্দ এখানে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে যে সত্য পরিবেশন করেছেন, আমরা জানি তাঁর সম্পর্কেও সে কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বামাক্ষ্যাপা সর্বপ্রথম সে কথা বলেছিলেন—"তোর গুরু হয়ে আমিও আজ ধন্য হয়ে গেলাম"। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাস-প্রদাতা গুরু সচ্চিদানন্দজী, যোগাচার্য্য সুমেরদাসজী এবং ভাবশিক্ষা দাত্রী সিদ্ধা

যোগিনী গৌরীমা—প্রত্যেকেই তাঁকে নিজেদের চেয়ে বড় বলে মান দিয়েছেন। তা ছাড়া আরও দু'একটা বিশেষ ঘটনার কথা জানি, যার প্রত্যেকটি সদ্‌গুরু নিগমানন্দদেবের জন্মসিদ্ধ গুরুত্বের নিদর্শন।

শ্রীনিগমানন্দদেব সাধকাবস্থায় নিগমের সিদ্ধ শ্রোতা, সিদ্ধাবস্থায় 'নিগম কর্ত্তা' জগদগুরুরই মানুষী তনু: শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'নিগম' শব্দের যে সব ব্যবহার আছে তা হতে স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীনিগমানন্দ স্বরূপে কে। [দ্রঃ ভাঃ ১১।২৯।৪৯, '০।১৬।৪৪ পন্থামৎ নিগম শ্রুত।]

সদ্‌গুরুকে প্রণিপাত ও সেবায় সন্তুষ্ট করলেই বেদবিদ্যার সার তত্ত্ব অধিগত হয়। সূর্য্যস্বরূপ সদ্‌গুরুর জীবন প্রভাতেই বেদান্ত বিদ্যা শতদলের মত প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং সদ্‌গুরু নিগম কর্ত্তা নিশ্চয়ই।

সমগ্র সারস্বত সংঘের একমাত্র পাবের কাণ্ডারী, শ্রীনিগমানন্দের শিষ্যভক্তবৃন্দের নিকট তাদের জীবনের ধ্রুবতারা, প্রাণের আরাধ্য দেবতা, নরবিগ্রহ পরব্রহ্মস্বরূপ হচ্ছেন শ্রীনিগমানন্দদেব স্বয়ং।

———

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী দেব

প্রণীত গ্রন্থ ও পত্রাবলী

যোগীগুরু

তান্ত্রিকগুরু

জ্ঞানীগুরু

প্রেমিকগুরু

ব্রহ্মচর্য-সাধন

বেদান্ত বিবেক

ঠাকুরের চিঠি

নারায়ণীদেবী অনূদিত ও

প্রণীত গ্রন্থাবলী

ঈশানু স্মরণে

ভগিনীনিবেদিতা

বাংলার সাধনা ও শ্রীনিগমানন্দদেব

নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ

নীলাচল বানী

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ জীবন প্রসঙ্গ

পিলাঙ্ক নিগমানন্দ

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে

সদগুরু বা গুরুবাদ প্রসঙ্গ